গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
কলিকাতা - ৬

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি, এস-সি,

'Two New Pala Records', 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়', আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু', 'ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার', 'আচার্য প্রমথনাথ বসু' 'Historical Relics etc. in the Bangiya Sahitya Parisad Museum'এরগ্রন্থকার; প্রবাসী, ভারতবর্ষ, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, Science & Culture, Journal of the Asiatic Society প্রভৃতি পত্রিকার লেখক;

বেঙ্গল কেমিক্যালের অবসর-প্রাপ্ত রাসায়নিক

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ··· কলিকাতা - ৬

প্রকাশ
অক্টোবর, ১৯

গ্রন্থকারের ঠিকানা—৯ই যোগোদ্যান লেন,
কলিকাতা-১১। ফোন : ৩৫-১৫৪৩।

প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স পক্ষে
শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য,
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

মুদ্রাকর : শ্রীতীর্থপদ রাণা, শৈলেন প্রেস,
২৩, যুগলকিশোর দাস লেন,
কলিকাতা-৬।

মূল্য : দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র

সংশোধন

৫ পৃষ্ঠা, ৩ পংক্তিতে 'গদাধর' স্থলে 'গঙ্গাধর' হবে
১১ পৃষ্ঠা, ৮ পংক্তিতে 'খাদু' স্থলে 'ক্ষান্তমণি' হবে
১২ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তিতে 'রবীন্দ্র' স্থলে 'বারীন্দ্রনাথ' হবে
৩৬ পৃষ্ঠা, শেষ পংক্তিতে ')।' স্থলে '),' হবে
৭৩ পৃষ্ঠা, ১৭ পংক্তির শেষের '(তর্জমাকৃত)' উঠে গিয়ে
৫ পংক্তির শেষে বসবে
৭৬ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তিতে 'ভরবস্ত' স্থলে 'ভরবস্তু' হবে

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু

—পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

সত্যেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের কথা শুনতে আপনার কাছে ১৯৬১ সনের ২৮ শে অক্টোবর বসেছিলাম। তখন দেখলাম, আপনার সম্মুখের দেয়ালে সত্যেন্দ্রনাথের 'পদ্মবিভূষণ'এর মানপত্রটি বাঁধানো আছে, কোন দেয়ালে আর কিছু নেই। তখনি স্থির করেছিলাম, এই বই আপনাকেই দেব।

মনোরঞ্জন

২রা আশ্বিন, ১৩৭০

কৃতজ্ঞতা

'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে সত্যেন্দ্রনাথের জীবনী লিখতে আরম্ভ করি। এই পত্রিকায়ই তার প্রথম ফল, 'জীবনপঞ্জী' প্রকাশিত হয়,—ফাল্গুন, ১৩৬৮, ৩১৭ পৃঃ। উনি আমাকে তার শেষ-প্রুফ দু'কপি দিয়েছিলেন। একটিতে সত্যেন্দ্রনাথের স্বহস্তের সংশোধনাদি নিয়েছিলাম। সে-টি আমি রেখে দিয়েছি। অপরটি ঐ ভাবে সংশোধন করে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। তা-ই প্রকাশিত হয়েছে। ফণীন্দ্রনাথই গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-কে প্রকাশক স্থির করে দিয়েছেন।

১৯৬১ সনের অক্টোবর মাস হতে এই জীবনী লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। ১৯৬২ সনের প্রথম ভাগে পাণ্ডুলিপির খসড়া তৈরী শেষ হয়। তখন দেখা যায় যে, সত্যেন্দ্রনাথের বাংলা ও তর্জমা সমেত ইংরাজী লেখা পুস্তকান্তর্গত করতে হবে এবং তার জন্য তাঁর স্বাক্ষরিত সম্মতি লওয়া আবশ্যক। এর জন্য প্রার্থী হলে তিনি সম্মতি দিলেন এবং আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে লিখে দিলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান চালাও।' তার পর পাণ্ডুলিপি লেখা হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের বিষয়ে প্রচার অতি সামান্য। তার কারণ, তিনি নিজের কথা কিছু বলতে চান না। যদি বলান যায়, তবে দেখা যায় যে ,তিনি কিছুমাত্র গৌরব প্রকাশ করেন না, বরং সব কিছুই যেন তাঁর কাছে সামান্য ব্যাপার। সুতরাং নানা স্থান হতেই তথ্য আহৃত হয়েছে। অনেক তথ্য তাঁর বান্ধবদের নিকট হতে পেয়েছি; তাঁরা সানন্দে দিয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের আবাল্যের এক বন্ধু একদিন সকাল বেলা তাঁর কাছে এসেছিলেন। মনে হল, কাছাকাছি বাড়ি আছে, শহরের বাইরেও থাকেন। এই বন্ধুটি সে দিন আমার এক পরম উপকার করে গেলেন, সে কথা বলছি।

আমার এক স্নেহভাজন বলেন, "জীবনীতে কি লেখা হল, তা সত্যেন্দ্রনাথের অনুমোদন করিয়ে নেওয়া ভাল।" কথাটি যুক্তিযুক্ত মনে হওয়ায়, পাণ্ডুলিপি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করি। উনি দেখতে রাজী হলেন না। বললাম, তাঁর পূর্বপুরুষের কথা তাঁর কাছেই শোনা ; যদি ভুল করে থাকি, সংশোধনের এই সুযোগ।

তখন অগত্যা উনি বললেন, 'তবে পড়, শুনি।'

সুযোগ পেয়ে পর পর দুই দিনে একবারে তাঁর ঢাকার জীবনে পৌঁছে গেলাম। কিছু কিছু সংশোধন, পুনর্লিখন করিয়ে দিলেন। কিন্তু তার পর আর দ্রুত অগ্রসর হয় না। সপ্তাহে দুই দিন তাঁর বাড়িতে যাই, যদি অন্য কেহ তখন থাকেন, তবে অন্য কথাই হয়। যদি না থাকেন, তবে পাণ্ডুলিপি পড়া সামান্য অগ্রসর হয়, অন্য প্রসঙ্গের আলোচনাই বেশী হয়। এমনি করে অল্পে অল্পে অগ্রসর হল। যখন শেষ বড় অধ্যায় দুটি বাকী, তখন আমার ইচ্ছা হল, এ দু'টি একসঙ্গে শোনাতে পারলে ভাল হয়। এই দুস্তর সাগর পারের চিন্তায় আমি যখন বিব্রত, তখন পূর্বোক্ত বন্ধুটি এলেন। পরস্পরের পরিবারের কুশলপ্রশ্নাদি হল। জানলাম, এঁর একটি উচ্চ-শিক্ষিত ছেলে বড় চাকরী করেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সহায়তা করেছিলেন। উনি প্রসঙ্গত সত্যেন্দ্রনাথের বাংলা লেখার খুব প্রশংসা করলেন। তার পর আমার হাতের লম্বা খাতাটি কি বস্তু জান্‌তে চাইলেন।

আমি দেখলাম, এই-ই সুযোগ ; আমি বলে বসলাম, 'আমি ওঁর জীবনী লিখেছি। শেষ দুটি অধ্যায় এখন পড়ব। আমার সৌভাগ্য,

আপনাকেও শোনাতে পারব। আপনি বলতে পারবেন, আপনার আবাল্য বন্ধুকে আমি কেমন এঁকেছি।'

পড়ার সময় উনি খুব উৎসাহ দিতে লাগলেন; সত্যেন্দ্রনাথ ২।১ স্থানে সংশোধন করিয়ে দিলেন। এই দীর্ঘ দুটি অধ্যায় এই বান্ধবের সাহচর্যে এক বৈঠকেই পাঠ করা শেষ হল। আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। এ হল ১৯৬২ সনের মধ্যভাগের কথা। তার পরে, এই এক বৎসরে সামান্য সংযোজন করতে হয়েছে।

এই বইএর প্রচ্ছদ-চিত্রটি এঁকে দিয়েছেন আমার পরম স্নেহাস্পদ শিল্পী ভূপতিরঞ্জন কর্মকার। চিত্রের কল্পনাও তাঁর-ই।

সত্যেন্দ্রনাথের প্যারিসের ছবির ব্লকটি ধার দিয়েছিলেন বিশ্বভারতী পত্রিকা, অন্যটি দিয়াছিলেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদ্। প্রথমটি ছেপেছেন বেঙ্গল অটোটাইপ; দ্বিতীয়টি ছেপেছেন ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও ডাঃ সুশীল রায় আমার বান্ধব। তাঁদের লেখা ব্যবহারের সানন্দ সম্মতিও পেয়েছি।

আমার বড় ভাইএর তুল্য তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পণ্ডিত মহাশয়) স্নেহবশত প্রুফ দেখে দিয়েছেন।

মুদ্রণের সৌকর্যসাধনে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স স্বাভাবিক দক্ষতা সহকারে যে যত্ন ও সহৃদয়তা প্রদর্শন করেছেন, তাও স্মরণীয় হয়ে রইল।

যে ভগবানের কৃপায় আমি এত সহৃদয়তাপেলাম এবং সে জন্য এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নূতন করে সুযোগ হল, সেই ভগবানের মঙ্গলহস্ত সর্বত্র প্রসারিত হোক্, এই প্রার্থনা। ইতি ৮ই শ্রাবণ, ১৩৭০

বিনীত

মনোরঞ্জন গুপ্ত

নিবেদন

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, আচার্য প্রমথনাথ বসু, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়-এর জীবনচরিত্র অনুধ্যানের সময় বাঙ্গালা দেশের যে চিন্তা, কর্ম ও চরিত্রের সন্ধান পেয়েছিলাম, তখনকার দিনে দিকে দিকে নানা সৃষ্টি ও তজ্জন্য ত্যাগের যে আদর্শ দেখেছিলাম, তা আমার মনে দেশগৌরবের দীপমালা হয়ে আছে।

সেই দীপমালার উজ্জ্বল আলোকে সে কালের পথ দেখা যায়, এ কালের পথের উপরেও সে আলো পড়ে, ভবিষ্যতেরও আভাস পাওয়া যায়।

সেই দীপশিখা হতে পরবর্তী কালের কত জনের জীবনে জ্ঞান-কর্ম, চরিত্রের আলো জ্বলেছিল। সেই আলো বহন করে আজও তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বাঙ্গালী যুবচিত্তের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

সেই শিখা অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জীবনে বিকীর্ণ হয়—মেধা, জ্ঞান, চরিত্র, কর্ম ও দেশগৌরববোধের মধ্য দিয়ে।

দেশগৌরববোধ পরম সম্পদ্। তা মানুষকে সৎ-পথানুবর্তী করে, গৌরব রক্ষায় যত্নশীল করে, গৌরব বৃদ্ধিতে উদ্দীপিত করে, নিজের বীর্যকে কল্যাণের পথে প্রবর্তিত করে।

বর্তমানের হতাশার দিনে এই গৌরববোধ আমাদের পরম সম্পদ্ হোক, ভগবানের চরণে এই প্রার্থনা।

৯-ই যোগোদ্যান লেন,
কলিকাতা-১১
২৬শে শ্রাবণ, জন্মাষ্টমী, ১৩৭০

মনোরঞ্জন গুপ্ত

সূচীপত্র

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জীবনপঞ্জী

খ্রীষ্টাব্দ

১৮৯৪ হরিণঘাটা (২৪ পরগনা)র নিকটস্থ বড়জাগুলিয়ায় পিতৃগৃহ। কলকাতায় পিতৃগৃহ ২২নং ঈশ্বর মিল লেনের বাড়িতে ১লা জানুয়ারি তারিখে জন্ম।
প্রাথমিক শিক্ষা—নিমতলা ঘাটের নর্মাল স্কুলে, তার পর গোয়াবাগানে New Indian Schoolএ (গঙ্গাধর বানার্জির স্কুল)

১৯০৭ হিন্দুস্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। পান-বসন্ত হওয়াতে এক বৎসর পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই।

১৯০৯ এন্ট্রান্স পাশ করেন : পঞ্চম স্থান। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন।

১৯১১ I.Sc. পাশ করেন। প্রথম হলেন। Physiology অতিরিক্ত বিষয়।

১৯১৩ B.Sc. পাশ করেন। গণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম।

১৯১৪ বিবাহ ; ডাঃ যোগীন্দ্রনাথ ঘোষের (কম্বুলিয়া-টোলা) একমাত্র সন্তান উষা সহধর্মিণী।

১৯১৫ M.Sc. পাশ করেন। মিশ্রগণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম।

১৯১৬ কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে রিসার্চ স্কলার হলেন। গবেষণার বিষয়, Relativity ইত্যাদি।

১৯১৭ বিজ্ঞান কলেজের লেকচারার হলেন—বিষয়, সাধারণ পদার্থবিদ্যা, গণিত।

১৯২০ পুস্তক রচনায় (Einstein. A. and Minkowski. H. The Principles of Relativity, 1920. Published by the Unlversity of Calcutta, 1920) P. C. Mahalanobis ও Dr. Meghnad Sahaর সঙ্গে যুক্ত-গ্রন্থকার হলেন।

১৯২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের রীডর হলেন।

১৯২৪-২৫ Zeitschrift fur Physik পত্রিকায় অধ্যাপক বসুর "Planck's law and the light quantum hypothesis" শীর্ষক আবিষ্কার-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় প্রবন্ধ "Heat equilibrium in Radiation field in presence of matter" ঐ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রবন্ধটি আইনষ্টাইন স্বয়ং জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে ঐ পত্রিকায় ছাপেন। আইনষ্টাইন অধ্যাপক বসুর আবিষ্কৃত তত্ত্বের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও করেন। পরে ওই তত্ত্ব এবং অধ্যাপক বসুকে অভিনন্দিত করে তিনি এক পত্র লিখেন। এই তত্ত্ব বসু-আইনষ্টাইন তত্ত্বরূপে জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করে। ফ্রান্সে গমন। সিলভাঁ লেভি ও মাদাম কুরীর সাথে সাক্ষাৎকার।

১৯২৫ জার্মানীতে আইনষ্টাইনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

১৯২৬ অক্টোবরে দেশে প্রত্যাবর্তন।

১৯২৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক হলেন।

১৯২৯ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি। ভাষণের বিষয়:

Tendencies in the Modern Theoretical Physics.

১৯৩৭ রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 'বিশ্বপরিচয়' অধ্যাপক বসুকে উৎসর্গ করলেন।

১৯৪৪ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে সাধারণ সভাপতি। ভাষণের বিষয়—The classical determinism and the quantum theory.

১৯৪৫ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনের সভাপতি ডাঃ ভাটনগরের অনুপস্থিতিতে অধ্যাপক বসুই সভাপতিত্ব করেন।

অক্টোবর মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক হলেন।

১৯৪৮-৫০ ভারতের ন্যাশনাল ইনস্‌টিটিউট অব সায়ান্সের চেয়ারম্যান।

১৯৪৮ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি; 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার জন্ম।

১৯৫১ Unescoর আহ্বানে প্যারিসে যান। তখন ইংলণ্ড ও জার্মানীতে ভ্রমণ করেন।

১৯৫২-৮ ভারতীয় রাজ্য-সভায় মনোনীত সভ্য।

১৯৫৩ ফ্রান্সের Council of National Scientific Research (CNRS)এর আমন্ত্রণে ইউরোপ যান। তাঁর নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার বিষয় আইনষ্টাইনের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ হয়। গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশ—বিষয়ঃ Unitary Theory. Comptes rendus, 1953

বুদাপেষ্টে শান্তি সম্মেলনে যোগদান। তথা হতে রাশিয়া।

১৯৫৪ ফ্রান্স ও জার্মানীতে গমন। প্যারিসে আন্তর্জাতিক সভায় পঠিত প্রবন্ধের বিষয়—Crystallography.
ভারত-সরকার পদ্মবিভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৫৫ CNRSএর আমন্ত্রণে ফ্রান্সে গমন করেন। সেখান হতে সুইজ্যরল্যাণ্ডের অন্তর্গত বার্ণ শহরে অনুষ্ঠিত 50 years of Relativity Conferenceএ যোগদান করেন। (আমেরিকাতে এক হাসপাতালে ১৮ই এপ্রিল, ১৯৫৫ অধ্যাপক বসুর গুরু আইনষ্টাইনের মৃত্যু)

১৯৫৬ ১লা জুলাই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে অধিষ্ঠিত হন। পঠন ও পরীক্ষা সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করেন।
ব্রিটিশ এসোসিয়েশন ফর দি এডভান্সমেণ্ট অব সায়ান্সের সভায় যোগদানের জন্য লণ্ডনে গমন।

১৯৫৭ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত। এলাহাবাদ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট উপাধি প্রদান।

১৯৫৮ রয়াল সোসাইটি অব লণ্ডন ফর প্রোমোটিং ন্যাচারাল নলেজ তাঁকে ফেলো নির্বাচন করেন। এই উপলক্ষে তিনি প্যারিস হয়ে লণ্ডনে যান।
তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর এমেরিটাস নির্বাচন করেন।
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ বিজ্ঞানের ক্লাশ প্রবর্তিত হয়।

ভারত-সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপকপদে বরণ করেন এবং তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্যপদ পরিত্যাগ করেন।

১৯৬১ রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে বিশ্বভারতী 'দেশিকোত্তম' উপাধি প্রদান করেন।

১৯৬২ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনস্‌টিটিউট কর্তৃক ডক্টরেট উপাধি প্রদান।

২৪শে মার্চ শনিবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণ দিলেন

১৯-২০ মে সুইডেনের অন্তর্গত এস্‌কিলষ্টুনা শহরে অনুষ্ঠিত শান্তিসম্মেলনে যোগদান করেন। পরে একবার মস্কো গিয়েছিলেন, শান্তিসম্মেলনে।

৬-৮ই আগষ্ট টোকিয়োতে বিজ্ঞান সম্মেলনে যোগদান করলেন।

১২ই অক্টোবর হায়দ্রাবাদে 'আংরেজী হটাও সম্মেলনে' বাংলা ভাষায় উদ্বোধন-ভাষণ দিলেন।

১৯৬৩, ২২শে মার্চ রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণ দিলেন।

জুলাই মাসে বৈজ্ঞানিক সফরে ইজিপ্টে গেলেন—ভারত ও মিশরের প্রাচীন ইতিহাস, নিজের বিজ্ঞান ও কলকাতায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে বক্তৃতা।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু
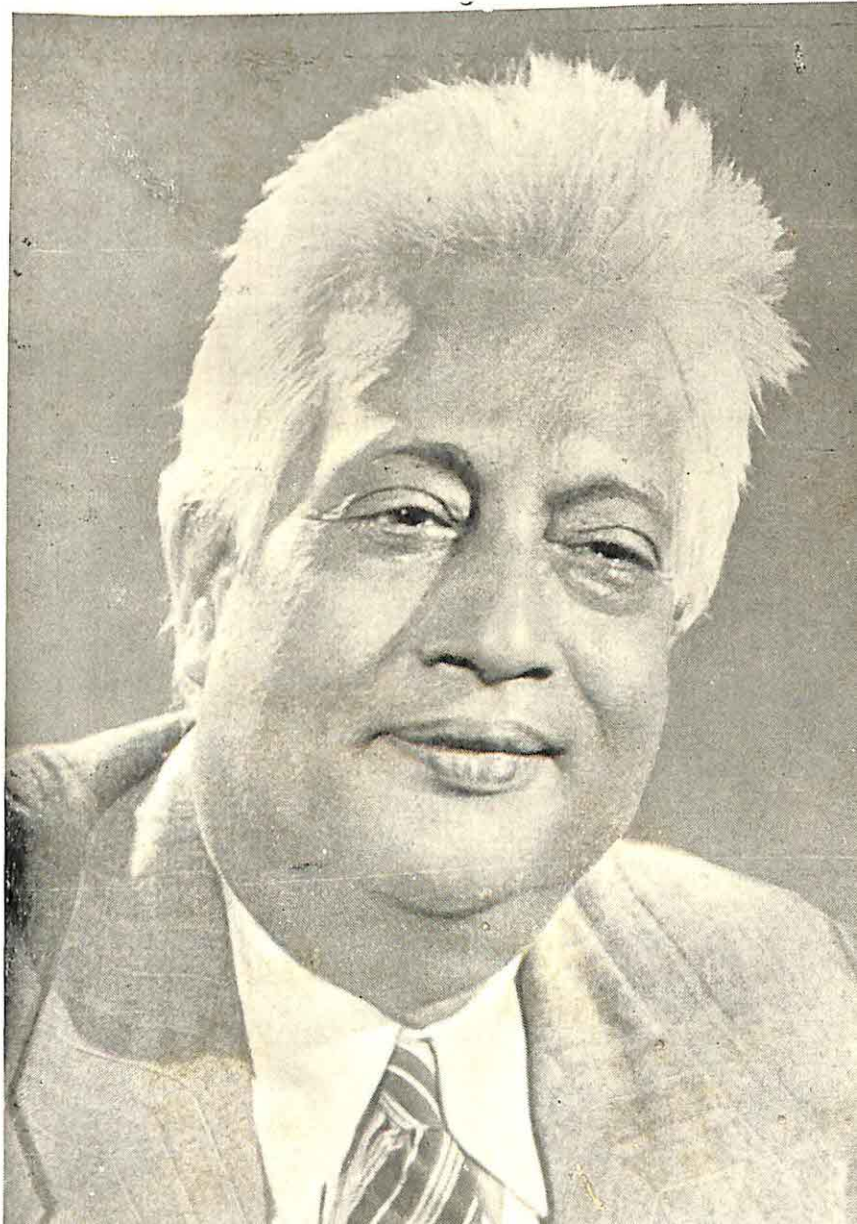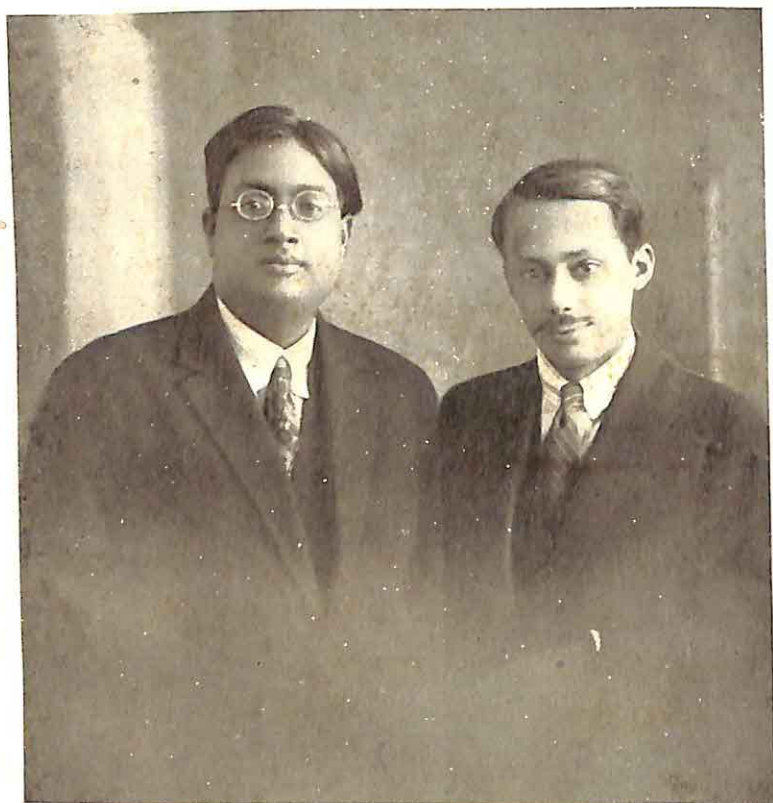
সত্যেন্দ্রনাথ ও প্রবোধচন্দ্র
প্যারিসে

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

ভারতের বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে যাঁর বৈজ্ঞানিক
গবেষণার তত্ত্ব এদেশের জনসাধারণের কাছে সব চাইতে অজানা,
অথচ যিনি খ্যাতিমান্ ও জনপ্রিয় তিনি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ
বসু। মাত্র ২৯ বৎসর বয়সের তাঁর আবিষ্কার মহামতি
আইনষ্টাইনের স্বীকৃতি লাভ করেছিল! বসু-আইনষ্টাইনের
নাম যুক্ত হয়ে তাঁদের যে বিজ্ঞান-কথা বৈজ্ঞানিকদের জগৎ-
সভায় প্রচারিত হয় তা এদেশের সাধারণ শিক্ষিতের কাছে
তত স্পষ্ট নয়। তবু তাঁর জগৎ-জোড়া খ্যাতির গৌরব আমরা
করি; কারণ তাঁর দেশবাসী জনসাধারণ, এমন কি মানুষ-
মাত্রেরই প্রতি যে মমতা প্রতিদিনের কর্মে ও চিন্তায় দেখা যায়
তা তাঁকে পরম জনপ্রিয় করেছে।

জন্ম ও পিতৃমাতৃপরিচয়

১লা জানুয়ারী, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণা জেলার বড়-
জাগুলিয়া গ্রাম (হরিণঘাটার নিকটস্থ) এর একটি স্বচ্ছল
গৃহস্থ পরিবারে অধ্যাপক বসুর জন্ম হয়। অধ্যাপক বসুর
পিতা সুরেন্দ্রনাথের বয়স এখন ৯৩ বৎসর। এখনও বসে
আমার সঙ্গে কথা বললেন (২৮ শে অক্টোবর, ১৯৬১ সন)।
তিনি বললেন, 'আমাদের দেশের বাড়ী বড়জাগুলিয়ায়। এখন

সেখানে লোকে বাসে যায়। আমরা কাঁচড়াপাড়া রেলষ্টেশন হয়ে যেতাম। সত্যেন জন্মেছিল কলকাতায়, আমাদের এই তিনপুরুষ আগেকার ২২ নম্বর ঈশ্বর মিল লেনের বাড়ীতেই। আমার স্ত্রীর (আমোদিনী বসু) মৃত্যু হয়েছে ১৯৩৯ সনে। সত্যেনের বয়স তখন ৪৫। সে আজ প্রায় ২৩ বৎসর আগেকার কথা।'

বড়জাগুলিয়ায় এঁদের কিছু ভূসম্পত্তি ছিল—লাখেরাজ নিষ্কর জমি। ২৪ পরগণার কালেক্টরীতে তার জন্য সেস দিতে হত। সুরেন্দ্রনাথ দেশে থেকেই পড়াশুনা করতেন, আর তাঁর পিতা মীরাটে সরকারী চাকরী করতেন। সেখানে পিতা গুরুতর অসুস্থ হয়েছেন খবর পেয়ে দেশ হতে সুরেন্দ্রনাথ সেখানে গিয়ে দেখেন আগের দিন তাঁর মৃত্যু ও সৎকার হয়েছে।

সেবারই সুরেন্দ্রনাথের এনট্রান্স পরীক্ষা দেবার কথা। এর পর তিনি গ্রাম হতে কলকাতায় এসে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে বাধ্য হলেন। ম্যালেরিয়া ও যাতায়াতের অসুবিধা; ক্রমে দেশের বাস উঠে গেল। এঁরা কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হলেন।

পূর্বপুরুষের পরিচয়

এ পরিবারের যিনি প্রথম জীবিকার্জনের জন্য গ্রাম হতে বাইরে গিয়েছিলেন তিনি মধুসূদন বসু। পূর্ববঙ্গের কোন সমুদ্রতীরস্থ লবণের ব্যবসায়ে তিনি লিপ্ত ছিলেন। বহু বৎসর পর যখন তিনি গ্রামের বাড়ীতে ফিরলেন তখন দেখা গেল তিনি তন্ত্রসাধক হয়েছেন; অঙ্গে রক্তাম্বর, তৈজসপত্রের মধ্যে নরকপাল।

মধুস্মূদন অর্থ বিষ্ণু—যিনি মধুদৈত্যকে বধ করেছিলেন। কিন্তু মধুস্মূদন বসু যে মাতৃসাধনার পথ নিয়েছিলেন তা তাঁর বংশপরম্পরায় নামের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। মধুস্মূদনের পুত্র হলেন দুর্গাচরণ। তাঁর পুত্র শ্যামাচরণ। শ্যামাচরণের পুত্র অম্বিকাচরণ।

এই অম্বিকাচরণ হলেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথের পিতামহ। শেষ জীবনে মীরাটে সরকারী হিসাবরক্ষক (Accountant) ছিলেন অম্বিকাচরণ। অধ্যাপক বসুর পিতা সুরেন্দ্রনাথের প্রথম জীবন দেশেই কেটেছিল।

সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে ছিলেন ই. আই. রেলে—পরে ই. বি. রেলের হিসাবরক্ষক (Accountant)। এই ভাবে অধ্যাপক বসুর পিতা ও পিতামহ দুইজনকেই আমরা সেই কার্যে নিয়োজিত দেখছি যাতে অঙ্কের ব্যবহার। সত্যেন্দ্রনাথের দাদামহাশয়ের নাম মতিলাল রায়চৌধুরী। ইনি অঙ্কের এম. এ.। তিনি পরে আইন-ব্যবসায়ী হয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের পিতার প্রপিতামহ দুর্গাচরণ ২২ নম্বর ঈশ্বর মিল লেনের বাড়ীর আদি পত্তন করেছিলেন। তিনি কলকাতার এক বিদেশী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ছিলেন। প্রপিতামহ শ্যামাচরণও সেখানেই কাজ করতেন।

বিদ্যারম্ভ

সত্যেন্দ্রনাথের যখন বিদ্যালয়ে যাবার বয়স হল তখন পিতা কলকাতায় বদলী হয়ে এলেন। ঈশ্বর মিল লেনের বাড়ীতে তখন নামমাত্র ভাড়ায় এক ভাড়াটে ছিলেন। তাঁকে তোলা গেল না। কলকাতায়ই শ্বশুরবাড়ী; তাঁদের মস্ত বাড়ী; সুরেন্দ্রনাথ সেখানে গেলেন না। নিমতলা অঞ্চলে ছোট্ট একটি বাড়ী ভাড়া করে সেখানেই উঠলেন। ছেলেকে জোড়াবাগান অঞ্চলে সেই নর্মাল স্কুলে ভর্তি করে দিলেন যেখানে একদিন রবীন্দ্রনাথ ছাত্র ছিলেন। এই স্কুলটি রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা'র ইতিহাসে দীপ্যমান হয়ে আছে।

"মনে আছে ছাত্রবৃত্তির নিচের ক্লাসে যখন পড়ি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট গোবিন্দ বাবু গুজব শুনলেন যে আমি কবিতা লিখি। আমাকে ফরমাস করলেন লিখতে, ভাবলেন নর্মাল স্কুলের নাম উঠবে জ্বলজ্বলিয়ে। লিখতে হোলো, শোনাতেও হোলো ক্লাসের ছেলেদের, শুনতে হোলো যে এ লেখাটা নিশ্চয় চুরি।" ...(রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা')

আনন্দ-কৌতুকে রবীন্দ্রনাথ জোড়াবাগান পল্লীর এই নর্মাল স্কুলের বিবরণটি দিয়েছেন। একই-স্কুলে-পড়া সত্যেন্দ্রনাথ এ-স্কুলের কোন প্রসঙ্গই আজ স্পষ্ট মনে রাখেননি। অধ্যাপক বসুর বয়স কবির চাইতে ৩২ বৎসর কম। তাই শিক্ষার কোন অঙ্গনে দুজনের দেখা হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু পরবর্তী কালে এঁদের দেখা হয়েছিল শিক্ষা ক্ষেত্রেই। সে ক্ষেত্র হল বিশ্বভারতী। সে বিবরণ পরে দেওয়া হবে।

সত্যেন্দ্রনাথ নর্মাল স্কুলে কিছুদিন পড়ার পর পিতা দর্জিপাড়ায় বাস উঠিয়ে আনলেন। তখন সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর কাকা অবনী—দুজনে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপরেই গদাধরবাবুর New India School এর ছাত্র হলেন। সুরেন্দ্রনাথ বললেন, "ক্লাসে প্রথম হত সত্যেন প্রতি পরীক্ষায়। একবারে প্রথম দিকে একটা অভ্যাস ছিল; যে পাতা পড়া হয়ে যেত সে-পাতা আর দরকার হবে না বলে ছিঁড়ে ফেলত। আমরা কিছুই বলতাম না। পড়ার জন্য কোন তাড়না করতে হয়নি কোন দিন। কোন বিষয়েই না। ছেলেদের সাধারণ খেলাধুলায় তার অভ্যাস ছিল। গ্রামে গেলে চারিদিকে ঘুরে বেড়াত আর দেখত। খুব কৌতূহলী। গাছে উঠতে দেখিনি। শরীর সুস্থই ছিল তখনও, এখনও ভগবানের দয়ায় তার কোন বড় অসুখ দেখিনি।"

"এণ্ট্রান্স ক্লাসে উঠলে সত্যেনকে হিন্দুস্কুলে ভর্তি করে দেই। তখন ওর বয়স ১৪ বৎসর। পানবসন্ত হয়ে একবৎসর গেল। পরের বৎসর এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করল (১৯০৯)।"

সত্যেন্দ্রনাথ পঞ্চমস্থান অধিকার করলেন। প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পেলেন। সেবার জামতারা স্কুলের রাধারমণ সিংহ প্রথম হয়েছিলেন। দ্বিতীয় হয়েছিলেন হিন্দু স্কুলেরই চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। ম্যালেরিয়া জ্বরে অকালে চণ্ডীদাসের মৃত্যু হয়। জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বর্ধমান হতে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম বৃত্তি পেয়েছিলেন। মেঘনাদ সাহা পূর্ববঙ্গের পৃথক বৃত্তি পেয়েছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া

সত্যেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। পড়লেন I. Sc.—অতিরিক্ত বিষয় নিলেন Physiology। ১৯১১ সনে পরীক্ষার ফল বেরলে দেখা গেল তিনি প্রথমস্থান অধিকার করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের 'ডাফ বৃত্তি' পেলেন। এ-বৎসরই মেঘনাদ সাহা ঢাকা কলেজ হতে ঢাকায় পরীক্ষা দিলেন। পূর্ববঙ্গের ছাত্রদের মধ্যে তিনি হলেন প্রথম। ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় নম্বরের যোগফল হল সত্যেন্দ্রনাথের সব চাইতে বেশী এবং গণিতে প্রথম।

মেঘনাদ এসে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন (১৯১১) B. Sc. ক্লাসে। সত্যেন্দ্রনাথের তখন আরও অনেক সহপাঠী ছিলেন যাঁরা কালে কালে যশস্বী হয়েছেন—জ্ঞানেন্দ্র-চন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানচন্দ্র মুখার্জি, মানিকলাল দে, পুলিনবিহারী সরকার, সুনীল বসু, নিখিল সেন প্রভৃতি। ২।১ ক্লাস উপরে পড়তেন প্রশান্ত মহলানবীশ, নীলরতন ধর ও রসিকলাল দত্ত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এঁদের সম্বন্ধে নাম ও পরিচয় দিয়ে লিখেছেন,

"১৯১১ খৃষ্টাব্দে বাংলার রাসায়নিক গবেষণার ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল…ঐ বৎসর কয়েকজন মেধাবী ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজে—তাঁহাদের মধ্যে এমন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল যাহা সচরাচর দুর্লভ। তাহাদের চরিত্রে এমনই একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে আমি তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম।"

১৯১৩ সনে গণিতে প্রথম হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ B.Sc. পাশ

করলেন। মেঘনাদের ঐ একই বিষয়ে অনার্স ছিল। তিনি হলেন দ্বিতীয়।

১৯১৫ সনে সত্যেন্দ্র ও মেঘনাদ দুইজনেই মিশ্রগণিতে M.Sc. পাশ করলেন। এবারেও সত্যেন্দ্র হলেন প্রথম, মেঘনাদ দ্বিতীয়। দুজনেই অসাধারণ মেধাবী, অচিরকাল মধ্যে দুজনেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগৎ-জোড়া নাম করলেন। প্রগাঢ় এঁদের বন্ধুত্ব এবং সর্বকর্মে সহযোগ ও সহানুভূতি। এই বৎসরই জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানচন্দ্র মুখার্জি প্রভৃতি পূর্বোল্লেখিত ছাত্রগণ রসায়নে M.Sc. পাশ করে উচ্চস্থান অধিকার করেন। সত্যেন্দ্রনাথের স্কুল ও কলেজের সময়কার তাঁর অনেক বিবরণ দিয়েছেন বান্ধব শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহ ও শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য। সে বিবরণ পৃথক অধ্যায়ে প্রদত্ত হল।

বিজ্ঞান কলেজে যোগদান

অতঃপর এই ছাত্রগণ কি করলেন তার বিবরণ সত্যেন্দ্র-নাথের ভষাতেই দিচ্ছি। সে বিবরণে বাঙ্গালাদেশের শিক্ষা-সংস্কার ও বিজ্ঞান পঠন পাঠনের ইতিহাস পরিস্ফুট হবে এবং সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সতীর্থদের এই কার্যে নিয়োগের কাহিনীও জানা যাবে।

"সিলেবাস ও পঠনের ক্রম নূতন করে লেখা হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষাকে একটি বিশিষ্টস্থান দেওয়া হল। ১৯০৮ সনের আগে অল্প কয়েকটি

কলেজে বিজ্ঞান পড়ান হত। নূতন সংস্কারের ফলে সহরে ও মফঃস্বলে বহু কলেজে বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার খোলা হল। তাঁরা বিজ্ঞানে হাতে কলমে শিক্ষা দেবার জন্য তহবিলও সংগ্রহ করলেন। এই ভাবে অস্নাতকদের (under graduate) পড়াশুনার দায় কলেজগুলি নিলেন; আর বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকদের উচ্চতর কলা, বিজ্ঞান ও আইন পড়াবার দায় নিজেই নিয়ে এগিয়ে এলেন। পরীক্ষকের সংস্থা হতে এমনি করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাপ্রদান ও গবেষণার একটি উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। এই নূতন আন্দোলনে স্যার আশুতোষ হলেন প্রধান ব্যবস্থাপক ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। কিছুদিন বেশ চলল। গভর্নমেণ্ট তাঁর কার্যক্রম অনুমোদন করলেন এবং তাঁর বিচারশক্তি ও দূরদৃষ্টির প্রতি দেশের জনগণের আস্থা হল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের সংস্কার করা হল। নানা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদ সৃষ্টির জন্য দান পাওয়া গেল—অঙ্ক, অর্থনীতি, ইতিহাস ও দর্শন। এই কয় বৎসরে যা সৃষ্টি হল তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি জনসাধারণের সম্ভ্রম হল। দুইজন বাঙালী আইনজীবী—স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের কাছ হতে মস্ত দান এল। জমি, বাড়ী ও নগদ টাকা। স্যার আশুতোষ তখন অনেকখানি এগিয়ে গেলেন; University College of Science and Technology (কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ) এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু ঘোষ ও পালিতের দানের

সঙ্গে এক বিচিত্র সর্ত ছিল। অধ্যাপকদের হতে হবে ভারতীয় বিজ্ঞানী।

বিজ্ঞান কলেজের সব বিশ্ববিদ্যালয়-অধ্যাপকদের আসনে বসবার মত উপযুক্ত ব্যক্তি তখনই পাওয়া গেল না। পদার্থ-বিজ্ঞানের পালিত-অধ্যাপক পদের জন্য সি.ভি. রমন নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি তখন ভারত সরকারের অর্থব্যবস্থা (Finance) বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। তিনি মনস্থির করার জন্য সময় চাইলেন। অধ্যাপনার ঝঞ্ঝাট তিনি চাচ্ছিলেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল অবসর মত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া। ১৯১৫ সনে স্যার পি. সি. রায়ের অবসর নেবার কথা। তারপর তিনি রসায়নের পালিত অধ্যাপক হয়ে রসায়ন-পরীক্ষাগারগুলির দায়িত্ব নিতে রাজী হলেন।

অধ্যাপক ডি.এম. বোস ও আঘরকর যথাক্রমে পদার্থ-বিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যার ঘোষ অধ্যাপক পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু নিজেদের গবেষণার জন্য জার্মানীতে প্রেরিত হবার অনুরোধ জানালেন। এ অবস্থায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিপ্রায় বিলম্বিত হল।

এদিকে প্রথম পৃথিবীযুদ্ধ ১৯১৪ সনে সুরু হয়েছিল। তারই ফলে অধ্যাপক বসু ও আঘরকর জার্মানীতে অন্তরীণ হলেন। দেশের স্কুলের পরিচালনা কে করবেন, গভর্নমেণ্ট না বিশ্ববিদ্যালয়, তাই নিয়ে বিতণ্ডা সুরু হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ব্যাপারে হস্তক্ষেপে স্যার আশুতোষ এক নির্ভীক প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়ালেন। ১৯১৫ সনে তিনি ভাইস-চ্যান্সেলার রইলেন না বটে

কিন্তু পালিত ও ঘোষের দানের অছিসভার সভাপতি রইলেন।

জাতীয়তার এই অন্দোলন বহু আদর্শবাদীকে দুঃসাহসী করেছিল। কয়েকজন তরুণ স্নাতক তখন বিজ্ঞানের চর্চায়ই আত্মনিয়োগ করবেন বলে স্থির করেছিলেন। ১৯১৫ সনের M.Sc. পরীক্ষার পরই তাঁরা উপদেশের জন্য স্যার আশুতোষের কাছে গেলেন। ভিন্নপ্রদেশের এক সরকারী কলেজের লেকচারারের পদের জন্য তাঁদের মধ্যে একজনের নাম প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি অত্যধিক গুণসম্পন্ন বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। (এবং সে-জন্যই তিনি নিযুক্ত হলেন না) তিনি ভাবছিলেন, তাঁর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান বৃদ্ধির কি উপায় হবে।" [১৯৬২ সনের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে অধ্যাপক বসুর ভাষণের কিয়দংশ তর্জমাকৃত)

এই ছাত্রদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথও ছিলেন। তিনি বলেছেন যে তাঁদের বন্ধু পদার্থ-বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ সাহস করে আশুতোষকে বলেন যে M.Sc. র সিলেবাসে বিজ্ঞানের নানা শাখা পড়ান হতে পারে বলে লেখা আছে— কোন কলেজে তা পড়ান হয় না, গভর্নমেণ্ট কলেজেও না; বিজ্ঞান কলেজে বিশ্ববিদ্যালয় এখন তা নিজেই পড়ালে ভাল হয়। আশুতোষ এঁদের উৎসাহ দিয়ে বলেন,'তোরা যদি পারিস তবে পড়া, তবে আমার খুবই আনন্দ হয়।'

এই আলোচনার ফলে ১৯১৬ সনে এঁরা প্রায় সকলেই বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা ও শিক্ষা প্রদানের কাজে নিযুক্ত

হলেন। সত্যেন্দ্রনাথ রিসার্চ স্কলার হলেন। গবেষণার বিষয়—Relativity ইত্যাদি। পর বৎসরই সেখানে লেকচারার হলেন—পড়াবার বিষয়, সাধারণ পদার্থ-বিদ্যা, গণিত।

বিবাহ, পুত্রকন্যাগণ

পিতা সুরেন্দ্রনাথের যখন ২৫ বৎসর বয়স তখন তাঁর প্রথম সন্তান সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তারপর পর পর তাঁর ৬টি কন্যা জন্মে। সত্যেন্দ্রনাথের এই ভগ্নীদের নাম স্নেহলতা, আশালতা, কনক, খাঁদু, তরুলতা ও বিদ্যুৎ। এঁদের মধ্যে এখন কনক সরকার, তরুলতা নাগ ও বিদ্যুৎ দাস বেঁচে আছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ B.Sc. পাশ করার পরই ১৯১৪ সনে পিতা তাঁর বিবাহ দেন। তখন তিনি B.Sc. তে গণিতে প্রথম হয়ে M.Sc. পড়ছেন; বয়স ২০ বৎসর। কলকাতার কম্বুলিয়াটোলার বিখ্যাত ডাক্তার যোগীন্দ্রনাথ ঘোষের একমাত্র সন্তান ঊষা কনেরূপে নির্বাচিতা হলেন। পর বৎসর (১৯১৫) সত্যেন্দ্রনাথ আবার গণিতে প্রথম হয়ে M.Sc. পাশ করলেন। নবপরিণীতা বধূ দাদার পড়া ও পরীক্ষার অন্তরায় হলেন না প্রমাণিত হওয়ায় ননদরা বৌদির উপর কত খুসী।

সত্যেন্দ্রনাথের পাঁচ কন্যা—নীলিমা, পূর্ণিমা, জয়া, শোভা, অপর্ণা। পুত্র রথীন্দ্র অপর্ণার বড়, রমেন্দ্র অপর্ণার ছোট। রমেন্দ্র সম্প্রতি প্রথম বিভাগে বিদ্যুৎ-ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্র্যাজুয়েট

হয়েছেন, রথীন্দ্র একটি বিদেশী বড় কোম্পানীতে ইঞ্জিনিয়ার। সত্যেন্দ্রনাথ শিক্ষার জন্য ছেলেদের বিদেশে পাঠান নি।

তাঁর প্রথম তিন কন্যার বিবাহ হয়েছে। নীলিমার স্বামী রবীন্দ্র মিত্র অকালে লোকান্তরিত হয়েছেন। তারপর পুত্র কমল ও নওয়ল দুজনেই এখন দাদামহাশয়ের প্রভাবে বড় হচ্ছে। দ্বিতীয় কন্যা পূর্ণিমা রায়ের স্বামী অরুণ রায় কুলটি আয়রন ওয়ার্কস-এর ডাক্তার। একটি পুত্র হয়েছে, নাম—অসীম। তৃতীয়া কন্যা জয়া চৌধুরীর স্বামী দেবপ্রসাদ চৌধুরী—এখন হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ী। এঁদের একটি পুত্র হয়েছে, নাম—রঞ্জন। রথীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়েছে। স্নেহ মমতা মায়া সেবায় মণ্ডিত এই সংসার সত্যেন্দ্রনাথের স্বভাব ও সাধনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা, প্রথমবার

সাধারণ পদার্থ-বিদ্যা ও গণিতের লেকচারার নিযুক্ত (১৯১৬) হয়ে তা পড়াতে পড়াতে সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভা তাঁকে ক্রমশ Relativity (আপেক্ষিকবাদ)এর চর্চা ও অনুধ্যানে নিয়ে গেল। মেঘনাদ সাহা পড়াতেন Theory of Radiation। তিনিও ঐ তথ্যে উদ্‌গ্রীব হলেন। সিলেবাসে পদার্থ-বিজ্ঞানের যত রকম শাখা আছে, এই প্রতিভাধরেরা পণ করলেন, সব শিখে নিতে হবে এমন করে যাতে ছাত্রদের আবশ্যক হলেই শেখান যায়। নিজেদের চিন্তাশক্তির খোরাক জুটবে জ্ঞানীদের

বই পড়ে, আর নবীনতম ছাত্রদের মনেও চিন্তার উন্মেষ ঘটান যাবে।

Boltzman, Drude ও Planck এর বিখ্যাত বইগুলি সব পড়া হয়ে গেল। এ সব বই ভাল করে পড়তে বুঝতে হলে একবারে জার্মান ভাষাতেই পড়া ভাল। মেঘনাদের আগেই অনেক জানা ছিল। সত্যেন্দ্রনাথেরও এই বিদেশী ভাষা শেখা হল। তখন সেই শিক্ষা কাজে লাগাতে ও বিশেষত ছাত্র মহলে Relativity তত্ত্ব প্রচারের জন্য ইংরাজী ভাষায় একটি বই লিখে ফেললেন মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথ। ভূমিকা লিখলেন, প্রশান্ত মহলানবিশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখন আনন্দ করে তার এই নবীন উৎসাহী বৈজ্ঞানিক-ছাত্র-অধ্যাপক-দের বই ছাপলেন। এই বই-এর পরিচয়পত্রে আছে—

Einstein. A. and Minkowski.H.
The Principle of Relativity,
1920

1. With Historical Introduction
   by P. C. Mahalanobis
2. On the Electrodynamics of Moving Bodies—
   is Einstein's first paper on the restricted
   theory of Relativity originally published in

the Annalen der Physik in 1905—translated from the original German
by Dr. Meghnad Saha

3. Albrecht Einstein—A short biographical note by Dr. Meghnad Saha
4. Principle of Relativity (H. Minkowski's original paper on the restricted Principle of Relativity first published in 1909)—translated from the original German
by Dr. Meghnad Saha
5. Appendix to the above by H. Minkowski —translated by Dr. Meghnad Saha
6. The generalised Principle of Relativity— A.Einstein's second paper of the Generalised Principle first published in 1916—translated from the original German
by Mr. Satyendranath Bose.

সত্যেন্দ্রনাথের চিত্তে এই ভাবে Relativity তত্ত্ব (আপেক্ষিকবাদ) যে চিন্তার উন্মেষ করল তা তাঁর উচ্চতর গণিতজ্ঞানের সাহায্যে তত্ত্বের অগ্রগতির পথ খুঁজতে লাগল। Restricted (সীমিত) তত্ত্ব যাতে পরিপূর্ণ তত্ত্ব হয়, এই সীমিত তত্ত্বের যে-সব অপূর্ণতা আছে তার যাতে মীমাংসা পাওয়া যায় সেই ধ্যানে তিনি নিয়োজিত হলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপনা চলতে থাকল। ১৯২১ সনেই তাঁর কাছে আমন্ত্রণ আসল; পদার্থবিজ্ঞানের রিডর (Reader) হয়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলেন। সেখানে প্রায় ২৪ বৎসর অধ্যাপনা করার পর ১৯৪৫ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যার খয়রা অধ্যাপক হয়ে তিনি আবার বিজ্ঞান কলেজে দ্বিতীয়বার অধ্যাপনা করেন। সে বিবরণ পরে প্রদত্ত হবে।

তাঁর প্রথমবার বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা করার সময়কার তাঁর যেসব ছাত্র যশস্বী হয়েছেন তাঁদের কয়জনের নাম—প্রিন্সিপ্যাল জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর), নৃপেন মজুমদার (ভারত সরকারের অর্থ-ব্যবস্থার পরামর্শদাতা), সুরেন্দ্র বানার্জি (ভাগলপুর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন), কুলেশ কর (প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক) ইত্যাদি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা ও ব্যবস্থাপনা কেমন হওয়া উচিত তারই অনুসন্ধানের জন্য 'স্যাডলার কমিশন' বসেছিল ১৯১৭ সনে। কেবল ঢাকা সহরের কলেজগুলিকে আয়ত্তে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হল ১৯২১ সনে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ৬০ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। অনেক বাড়ী ছিল, অনেক বড় বড় বাড়ী তৈরিও করা হল। প্রভাসচন্দ্র মিত্র তখন বাঙ্গালা দেশের শিক্ষামন্ত্রী। এখান হতে ৪॥০ লক্ষ টাকা পাঠান হল।

অধ্যাপনার জন্য নানা ক্ষেত্রের প্রথিতযশা অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের ক্রমে ক্রমে সমবেত করা হল। আইনের প্রধান হয়ে গেলেন ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার গেলেন ইতিহাসের অধ্যাপক হয়ে। অধ্যাপকদের বেতনের হার স্থির হয়েছিল ৬০০৲ হতে ১৮০০৲। অঙ্কের অধ্যাপক ডাঃ ভূপতি সেন ঢাকা কলেজে গভর্নমেণ্টের যে চাকরী করতেন তা ছাড়লেন না। তা হতে ছুটি নিয়ে কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়ে গেলেন। তারপর তা ছেড়ে দিয়ে পূর্বের চাকরীতে গেলেন। তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে অবসর গ্রহণ করেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও গেলেন। ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষও রসায়নের জন্য আমন্ত্রিত হলেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মোহিতলাল মজুমদারও গিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্য পড়াতে।

পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন জেঙ্কিন্স। আর সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে গেলেন রিডর হয়ে; বেতন ৪০০৲ হতে ১২০০৲। তখন তাঁর বয়স ২৭ বৎসর মাত্র।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উজ্জ্বল নক্ষত্রকে ঢাকার অধিবাসীরা আগেই জানতেন তাঁর ছাত্রজীবনের খ্যাতিতে। ইনিই সেই বসু যিনি মেঘনাদের মত পূর্ববঙ্গের অমন প্রতিভাধরকে B. Sc. ও M. Sc. পরীক্ষায় পুরোবর্তী হতে দেন নি। সম্প্রতি (১৯২০) তাঁদের আপেক্ষিকবাদ সম্বন্ধীয় যে বই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেছেন, তার আধুনিকতম অংশ এই সত্যেন্দ্রনাথেরই লেখা।

ছাত্রগণ দেখলেন, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের পাঠ্যপুস্তক পড়ান, অনেক সময় সিলেবাসের বিষয়বস্তু ভাল করে বোঝাবার জন্য পাঠ্যপুস্তকের বহির্ভূত কথাও বলেন। ক্বচিৎ বা উৎকৃষ্ট চিন্তাশীল মেধাবী মনোযোগী ছাত্র পেলে অঙ্ক, পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়নের এমন অনেক সূক্ষ্ম সমস্যা ও তার নিরসনের ইঙ্গিত দেন, যা তাদের মনে গবেষণার আকাঙ্ক্ষা জাগায়।

দেখা গেল, কেবল পদার্থ-বিদ্যা, অঙ্ক ও রসায়নশাস্ত্র নয়—ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নানাদেশের ধর্ম সমাজ ও কৃষ্টি জানার জন্যও তাঁর অনুরাগ। তাই কেবল বিজ্ঞানের অধ্যাপকগণ নন—অন্য সকল বিষয়ের অধ্যাপকগণও তাঁর বান্ধব হলেন।

আজন্ম কলকাতায় লালিত পালিত বর্ধিত হয়েও তাঁর স্বাভাবিক সহৃদয় মন ঢাকায় ছাত্র, সহকর্মী ও জনসাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে সমর্থ হল। তাই দীর্ঘ ২৪ বৎসর ঢাকায় অবস্থিতি তাঁর কাছে প্রীতিকরই হয়েছিল।

পড়াবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের গবেষণা চলছিল। জ্যোতিঃ-কণাবাদের যে সব অংশ অপূর্ণ ছিল, তার অনেকখানি তিনি ১৯২৪ সনে পূর্ণ করতে পারলেন। এই জীবনীর "সত্যেন্দ্রনাথ—বান্ধবদের চক্ষে" অধ্যায়ে বৈজ্ঞানিক গিরিজাপতি ভট্টাচার্য মহাশয় এই গবেষণার বিবরণ দিয়েছেন। যে সব পাঠকের বিজ্ঞানের সঙ্গে তত পরিচয় নেই, তাঁদের কাছে এ-বিবরণ খুব সহজ-বোধ্য হবে না। তবু লিপিকুশল বৈজ্ঞানিক ভট্টাচার্য মহাশয় বিষয়টিকে অনেকখানি সহজ করেছেন।

জ্যোতিঃকণাবাদের এই নূতনতর তত্ত্ব সত্যেন্দ্রনাথ ইংরাজী ভাষায় চার পৃষ্ঠামাত্র স্থান মধ্যে লিখে জার্মানীতে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানকার পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর দেখা করার খুব ইচ্ছা। নানা বিষয়ে আলোচনা করা যায়—এই সব পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনায় নিজের জ্ঞান ও চিন্তা উন্নততর তথ্যে ও তত্ত্বে পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু তখনি তা সম্ভব হল না।

দুই বৎসর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সঙ্কটকাল উপস্থিত হল। পুরাতন বাড়ীর দাম গভর্ণমেণ্ট কেটে নেন এবং নূতন বাড়ী তৈরিতে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল। তহবিলে নগদ বিশেষ নেই, গভর্নমেণ্ট হতেও আর বেশী টাকা এল না। ভাইস-চ্যান্সেলার হরটগ সাহেব মুস্কিলে পড়লেন। কাউন্সিল

ডাকলেন। অধ্যাপক, রিডর ও লেকচারার প্রভৃতির বেতনের স্কেল কমিয়ে দেওয়া হল। অনেককে নোটিশ দেওয়া হল।

সত্যেন্দ্রনাথকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জানালেন যে, তখনকার তাঁর ৫০০৲ বেতনকে ৬০০৲ করে দেওয়া হচ্ছে; তবে রিডরের সর্ব্বোচ্চ বেতন হবে ১২০০৲ স্থলে ৮০০৲। কিন্তু তাঁকে বিদেশে পাঠান হবে। তাঁর যাতায়াত-জামাকাপড়ের ব্যয় বিশ্ববিদ্যালয় দেবেন। বিদেশে তাঁকে মাসে ২৫০৲ পাঠান হবে এবং তখন তাঁর বাড়ীতে মাসিক ২০০৲ দেওয়া হবে। তিনি যে বিদেশে গবেষণা-প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন, এ-খবর বিশ্ববিদ্যালয় জানতেন না। সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভা প্রত্যক্ষ করেই তাঁরা এই ভাবে প্রায় ১২০০০৲ ব্যয়ে প্রস্তুত হলেন।

এমন সময় সত্যেন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করে এল বিশ্ববিখ্যাত আইনষ্টাইনের নিকট হতে তাঁর কাছে একটি পোস্টকার্ডের চিঠি। কর্তৃপক্ষ এটি চেয়ে নিলেন। তাঁরা যখন দেখলেন, অতি যোগ্য পাত্রেই তাঁরা অর্থব্যয় করছেন, তখন তাঁরা খুব তৃপ্তি পেলেন। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমে ফ্রান্সে পৌঁছে সেখানেই বাসা বাঁধলেন।

ফরাসী ভাষায় কথা বলায় সত্যেন্দ্রনাথের খুব অসুবিধা হল না। ও-বিদেশী ভাষা তাঁর জানাই ছিল। কলকাতায় হালসী-বাগান অঞ্চলে তাঁর পিতার একটি কেমিক্যাল কারখানা ছিল। এক বন্ধুর সাথে অবসর সময় সেখানে তিনি অল্পকিছু রাসায়নিক দ্রব্য ও কিছু ঔষধ তৈরী করাতেন। সেই কারখানায় একদিন সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বালককালে এক ফরাসী ভদ্রলোকের দেখা

পান। তাঁর যোগে নামমাত্র চাঁদায় তিনি তখন শ্যামবাজারের এক বাড়ীতে সন্ধ্যা বেলা ফরাসী ভাষা শিখতেন। কিন্তু অল্পদিন পরে ঐ অঞ্চলেই পশুপতি ও গিরিজাপতি ভট্টাচার্য মহাশয়দের বাড়ীর আড্ডার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হওয়াতে তিনি ফরাসী শেখার সে সমিতি ছেড়ে দেন।

এর পর কলেজে পড়ার সময় আর একবার ফরাসী ভাষা তাঁর রপ্ত হয়েছিল। বেশী রপ্ত হয়েছিল M. Sc. পড়ার সময়। তখন ধূর্জটি প্রসাদের সঙ্গে উনি প্রমথ চৌধুরীর বাড়ীতে তাঁর 'সবুজ পত্রের' আড্ডায় যেতেন এবং সেখান হতে ফরাসীভাষার বই এনে ঘন ঘন পড়তেন। (এসব বিবরণ অধ্যাপক বসুর কাছেই শুনেছি।) বই পড়তেন, কিন্তু ফরাসী উচ্চারণে তত অভ্যাস ছিল না। ওখানে গিয়ে ক্রমশ তা অভ্যাস হল। ভাষার জন্য খুব অসুবিধা হল না।

ফ্রান্সে সত্যেন্দ্রনাথ, প্রথম বার

'১৯২৪ সন···ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আমি প্রথম বিদেশ যাত্রা করি। ভারতের বাইরে যাওয়া এই প্রথম। বিদেশে গিয়ে কোথায় থাকব, কার সঙ্গে কি ভাবে পরিচয় করব, সে-দেশের আচার-আচরণের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেব কি ভাবে—এই রকম নানা প্রশ্ন মনে জেগেছিল। আর, এই সব প্রশ্ন সঙ্গে নিয়েই আমি যাত্রা করি।'

'প্যারিসে পদার্পণ করেই আমার সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেল।···প্রবোধচন্দ্র বাগচীর সঙ্গে আমার পরিচয় হল।··· অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভির অধীনে তখন তিনি গবেষক ছাত্র।'

'ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েসন' নামে প্যারিসে ভারতীয় ছাত্রদের একটা আড্ডা ছিল।···বাগচী ছিলেন এর সেক্রেটারী। দেশে যে সব ছাত্র বিপ্লবী নামে মার্কামারা ছিল —এই এসোসিয়েসনে ছিল তাদের আশ্রয়। ইউরোপের বিভিন্ন সহরে এর শাখা ছিল, প্যারিসে ছিল প্রধান ঘাটি। —17, Rue du Sommerard ছিল তার ঠিকানা। এই বাড়ীতে আমরা একত্র থাকতাম। একত্রে খাওয়া দাওয়া করতাম। —[বিশ্বভারতী পত্রিকা, দ্বাদশ বর্ষ, ৩১৯ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক বসুর প্রবন্ধ 'প্রবোধচন্দ্র বাগচী' হতে উদ্ধৃত]

যে সব বৈজ্ঞানিকের তখন খুব নাম ও প্রতিষ্ঠা, তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য তখন তাঁর খুব আগ্রহ। বাগচীর

সহায়তায় লেভির কাছ হতে পরিচয়পত্র নিয়ে তিনি প্রথম লাসভার কাছে যান। তিনি নানা জনকে চিঠি দেন। তাই নিয়ে তিনি মাডাম কুরির সঙ্গে দেখা করেন।

মাডাম কুরির তখন অনেক বয়স। তিনি দ্রুত অনেক কথা বললেন। 'ফরাসী শেখ, নতুবা কিছু হবে না। ফরাসী শিখে এলে তারপর অনেক কিছু শিখতে পারবে।' সত্যেন্দ্রনাথের তখন ফরাসী শেখা হয়েই ছিল, অন্তত কাজ চলার মত। কিন্তু বৃদ্ধার দ্রুত ও ভারিক্কী কথায় দমে গেলেন। অন্য গবেষণাগারের সঙ্গে যুক্ত হতে উদ্যোগী হলেন।

জার্মানীতে আইনষ্টাইন তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ হয়তো ভাবলেন, ফ্রান্সে কিছুদিন থাকি; বিজ্ঞানের গবেষণা করি—আর ইউরোপের ললিতকলা, চিন্তা ও কৃষ্টির জগতের মধ্যমণি এই ফরাসী দেশে থেকে দেখি পাশ্চাত্যের সভ্যতার ধ্যান ধারণা, বুঝি ভারতের সঙ্গে তার অন্তরে কোথায় অমিল, কোথায় বা তারা এক।

ফ্রান্সে বছরখানেক ছিলেন। মরিস ডিব্রোলীর পরীক্ষাগারে রঞ্জন রশ্মি সম্বন্ধে কাজ করেছিলেন। মরিস বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছিলেন। এঁর ভাই বিশ্ববিখ্যাত লুঁই ডিব্রোলী পরে নোবেল প্রাইজ পান। কলেজ অব ফ্রান্সের বিখ্যাত অধ্যাপক লাসভার সঙ্গে তো প্রথম হতেই যোগ ছিল। এর পরে সত্যেন্দ্রনাথ কুরীর কাছেও কাজ করেছিলেন।

জার্মানীতে আইনষ্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

১৯২৫ সনে সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্ববিখ্যাত আইনষ্টাইনের সঙ্গে মিলিত হলেন বার্লিন সহরে। তখন আইনষ্টাইনের বয়স ৪৫, সত্যেন্দ্রনাথের ৩১। গুরু শিষ্যকে পরমস্নেহে গ্রহণ করলেন। ১৯৫৬ সনের ১৮ই এপ্রিল আমেরিকার এক হাসপাতালে আইনষ্টাইনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু অবধি প্রায় ৩০ বৎসর এই দুই মহাপণ্ডিতের চিন্তায় ও কর্মে যোগ ছিল।

মৃত্যুর পর সত্যেন্দ্রনাথ আইনষ্টাইনের যে জীবন-কথা লিখেছেন, তা এই মনীষীর জীবন ও তাঁর আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মনোজ্ঞ পরিচয়।

"আইনষ্টাইন লিখেছেন—'সুখী, ক্ষীণজীবী উদ্ভিদের মত ছাত্রদের মনে এই অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তিকে লালন করতে হয়। সযত্নে উদ্দীপনা জাগ্রত করবার চেষ্টা তো আছেই, কিন্তু বিশেষ করে দরকার বাঁধাধরা নিয়মের পাশ থেকে মুক্তি। পক্ষান্তরে জোর করে দায়িত্বের ভার চাপিয়ে অনুসন্ধানের আনন্দ মনে ফুটিয়ে তোলা যাবে কিম্বা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করা যাবে, এটা ভাবা মস্ত ভুল। চাবুক হাতে জোর করে অনবরত খাওয়ানোর চেষ্টা করলে শিকারী বন্য জন্তুরও অবশেষে খাদ্যে অরুচি জন্মান অসম্ভব নয়।" (সত্যেন্দ্রনাথের আইনষ্টাইন সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় প্রবন্ধ হতে উদ্ধৃত)

সত্যেন্দ্রনাথ একদিকে আইনষ্টাইনের তত্ত্বান্বেষী শিষ্য, অন্যদিকে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের দায়িত্বশীল শিক্ষক। শিক্ষণ-

পদ্ধতির যে বর্ণনা উপরোক্ত পংক্তি কটিতে আইনষ্টাইন দিয়েছেন, সত্যেন্দ্রনাথের শিক্ষণ-পদ্ধতিও তাই। এজন্যই তিনি ছাত্রগণের বান্ধব ; তাঁর মন, জ্ঞান ও হৃদয় সকলেরই জন্য নিয়োজিত।

জার্মানীতে থাকার সময় পণ্ডিত প্লাঙ্কের সাথেও তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হলেন

সত্যেন্দ্রনাথ ১৯২৬ সনের অক্টোবর মাসে দেশে ফিরে এলেন এবং পরবৎসরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক হলেন।

তাঁর আমলের ঢাকার যে সব ছাত্র পরে যশস্বী হয়েছেন, তাঁদেব মধ্যে কয়েকজনের নাম—

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, হাওয়া বিভাগের ডিরেক্টর সুধীন সেন, প্রমথনাথ সেনগুপ্ত, অক্ষয়ানন্দ বসু, জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ডাঃ আব্দুল মতিন প্রভৃতি।

ভারতীয় বিজ্ঞান সমিতি প্রভৃতি ভারতীয় বিজ্ঞান সংঘগুলির সঙ্গে অধ্যাপক বসুর যোগ

১৯২৯ সনে মান্দ্রাজ সহরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই সব অধিবেশনে দেশের বহু বিজ্ঞান-সেবক সমবেত হয়ে থাকেন, বিদেশের অনেক বৈজ্ঞানিকও আমন্ত্রিত হয়ে আসেন।

মান্দ্রাজের এই অধিবেশনে নোবেল পুরস্কার-খ্যাত স্যার সি. ভি. রমন মূল সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করলেন। অতি বেগুনী বিচিত্র একরূপ রশ্মির সাহায্যে তিনি একটি অভিনব আবিষ্কার করলেন। ঐ রশ্মি (আলো)র যে স্বাভাবিক স্পন্দন আছে, দেখা গেল— কঠিন বা তরল বস্তু বা গ্যাসের উপর প্রয়োগে সে স্পন্দনের পরিবর্তন ঘটে। এবং বিভিন্ন উপাদানের উপর এই রশ্মির প্রয়োগে ঐ পরিবর্তনও হয় বিভিন্ন। বর্ণালী-মান-যন্ত্র (spectrometer)এর সাহায্যে তিনি দেখালেন স্পন্দন-সংখ্যার পরিবর্তন। সারা বিশ্বের পণ্ডিতমণ্ডলী এই স্পন্দন-সংখ্যার পরিবর্তনকে Raman Effect বা 'রমনের ক্রিয়া' বলে অভিনন্দিত করলেন।

রমন হলেন মূল সভাপতি, আর গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি হলেন বসু-আইনষ্টাইন তত্ত্বের স্রষ্টা অধ্যাপক বসু। ছাত্রজীবন উত্তীর্ণ হয়ে বসু যখন কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞানের লেকচারার হয়েছিলেন, তখন

রমন ছিলেন সেখানে সে বিভাগের পালিত-অধ্যাপক। আজ সত্যেন্দ্রনাথও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়েছেন। তাই প্রবীণ ও নবীন এই দুই অধ্যাপকের সম্মিলন বড় প্রীতিকর হল।

সত্যেন্দ্রনাথের সভাপতির ভাষণের বিষয় হল, "Tendencies in the Modern Theoretical Physics"; সারা পৃথিবীর নানা দেশে পদার্থ-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি লক্ষিত হয়েছিল, তার একটি মনোজ্ঞ চিত্র উদ্ঘাটিত হল। ভবিষ্যতের গবেষণার ইঙ্গিতও সেই চিত্রে পাওয়া গেল।

১৯৪৪ সনে অধ্যাপক বসু ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে মূল সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করলেন। ভাষণের বিষয় হল "The Classical Determinism and Quantum Theory। এটি তাঁর নিজেরই গবেষণার বিষয়—যা তাঁর পৃথিবী-জোড়া যশের হেতু—যে তত্ত্বের অগ্রগতির চিন্তা, বসু-আইনষ্টাইন তত্ত্বের আরও আরও অগ্রগতির ধ্যান, আজও চলছে।

পর বৎসর (১৯৪৫) ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হল নাগপুরে। নির্বাচিত মূল সভাপতি ডাঃ এস. এস. ভাটনগর তখন বিদেশে। তিনি উপস্থিত হতে পারলেন না। অধ্যাপক বসুর সভাপতিত্বেই এই অধিবেশনের কাজ হল।

ভারতবর্ষের এই বিখ্যাত বিজ্ঞান সমিতির সূত্রপাত ও ক্রমপরিণতির ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। এদেশের বৈজ্ঞানিকরা —ইউরোপীয় ও এদেশীয়—সবাই এসিয়াটিক সোসাইটির আশ্রয়ে মিলিত হতেন। ১৯০৪ সন পর্যন্ত সোসাইটির পত্রিকা

তিন ভাগে প্রকাশিত হত। (১) History, Literature etc, (২) Science, (৩) Anthropology। বৎসরে এক এক ভাগে ৪টি সংখ্যা। পৃথক ভাগে এত লেখা না পাওয়ায় সব এক সঙ্গে করে দেওয়া হয় ১৯০৫ সন হতে।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা ক্রমে একটি পৃথক্ সমিতি গঠনের আবশ্যকতা অনুভব করলেন। এসিয়াটিক সোসাইটির ১নং পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীতেই ১৯১২ সনের ২রা নভেম্বর সম্মিলিত এক সভায় তাঁরা যা স্থির করলেন, তার ফলে ১৯১৩ সনের ২০শে নভেম্বর Indian Science Congress Association-এর জন্ম হল। এবং ১৯১৪ সনের ১৫ই হতে ১৭ই জানুয়ারী তারিখ পর্যন্ত ঐ বাড়ীতেই যে প্রথম বিজ্ঞান কংগ্রেস বসল, তার সভাপতি হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সে সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন ১০৫ জন বৈজ্ঞানিক। আর আজকাল কংগ্রেস উদ্বোধন-দিনে যে অভ্যাগত দেখা যায়, তার সংখ্যা হয় প্রায় ৫০০০ হাজার। ১৯১৪ সনে প্রথম বার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অধিবেশনের সময় ভারতীয় যাদুঘরের শতবার্ষিক উৎসব হয়েছিল। তাই তখন বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিত হবার সুবিধা হয়েছিল।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের এই জন্মকালে সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতি M. Sc. ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। অনেকেই পরবর্তী কালে সভাপতি হয়েছিলেন। সে বিবরণ বড়ই আনন্দের।

জন্মাবধি (১৯১৪) ২৫ বৎসর ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের কাজ এসিয়াটিক সোসাইটি দ্বারাই পরিচালিত হত। কেবল কার্যবিবরণী এসিয়াটিক সোসাইটি পৃথক ছেপে দিতেন।

১৯৩৪ সনের বোম্বাই-অধিবেশনে কংগ্রেস স্থির করলেন, তাঁদের একটি National Institute of Sciences of India দরকার। পর বৎসর কলকাতার সভায় এই সমিতি গঠিত হল। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এসোসিয়েসন, ১৯৩৮ সনে এসিয়াটিক সোসাইটি হতে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হয়। ১৯৫২ সনের দিল্লী অধিবেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী তাঁরা এখন ৬৪ নম্বর দিলখুসা ষ্ট্রীট, কলকাতা-১৭, ঠিকানায় ২৯ কাঠা জমির উপর বিরাট্ উদ্যানসমন্বিত বাড়ী করেছেন। সেখানে প্রেক্ষাগৃহ ও পাঠাগার বৈজ্ঞানিকদের আকর্ষণের ক্ষেত্র। বৈজ্ঞানিকদের এই সব প্রচেষ্টায় সত্যেন্দ্রনাথ অন্যতম প্রধান কর্মী। তিনি ১৯৪৮ হতে ১৯৫০ পর্যন্ত National Institute of the Sciences of India (ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান সংস্থা)র সভাপতি ছিলেন।

কিন্তু এদেশে নানা কারণে যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম, পালন ও খ্যাতি অর্জনের প্রধান কারণ হয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ, তা হল ১৯৪৮ সনে গড়া 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদ্'। সৃষ্টি অবধি তিনি এর সভাপতি।

সত্যেন্দ্রনাথের ধারণা, মাতৃভাষায়ই ছাত্রদের বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যায়; বিজ্ঞানের নানা তথ্য জনসাধারণকে মাতৃভাষায়ই পরিবেশন করা যায়। সর্বোপরি বিজ্ঞানের ধারায় জনসাধা-

রণের চিন্তা ও জীবনযাত্রাকে প্রবাহিত করার তাই-ই একমাত্র পথ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক থাকার কালে, তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের উৎসাহে এই উদ্দেশ্যেই 'বিজ্ঞান পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে (১৯৪৮) 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নাম নিয়ে যে পত্রিকার জন্ম হল, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার তা প্রধানতম মুখপত্র। অন্য অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

সত্যেন্দ্রনাথ—বান্ধবগণের চক্ষে

যাঁর কাছে যতটা পারি, সত্যেন্দ্রনাথের জীবনের কথা জেনে নেবার উদ্দেশ্যে তাঁর বান্ধবগণের নাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম, একটা সুযোগ পেয়ে। কারণ, এই আত্মভোলা মানুষটিকে নিজের কথা বলান খুব সহজ নয়। দেখেছিলাম, সবাই তাঁর বন্ধু—বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবা, কিশোর, বালক, শিশু—স্ত্রী ও পুরুষ।

কেউ তরুণ ছাত্র, কেউ অধ্যাপক, কেউ প্রতিবেশী, কেউ নিতান্তই অচেনা—সবাই তাঁর কাছে আসেন, অবারিত দ্বার। তাঁদের এক এক জনের এক একরূপ আকাঙ্ক্ষা; যতটা সম্ভব তা পূরণ হয়। জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা হয়। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সঙ্গীত, কবিতা আলোচিত হয়। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, সহৃদয়তা ও সত্যপথ সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা।

ক্ষণে ক্ষণে টেলিফোন বেজে ওঠে। রাসায়নিক চান

নূতন বিষয়ের সন্ধান, যে-দিকে তাঁর অনুসন্ধানী গবেষণা চালিয়ে দিলে তা কোন নবীন শিল্পে নিয়োজিত হবার সম্ভাবনা আছে। বিদেশী বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকার সংবাদদাতা চান তাঁর অভিমত, মহাকাশের নবতম অভিযানের সম্বন্ধে। কলকাতার যেখানে যত সভা, প্রদর্শনী, গৃহপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি অনুষ্ঠান, সেখানে অধ্যাপক বসুকে পুরোহিতরূপে পাবার জন্য অনুষ্ঠাতারা ছুটে ছুটে আসছেন। যদি একটু সময় দিতে পারেন।

বললেন, 'সহপাঠীদের মধ্যে মেঘনাদ, শৈলেন ঘোষ, মাণিকলাল দে, জ্ঞান ঘোষ, সুরেন মুখার্জি (নির্বেদানন্দ) বেঁচে নেই। সুশীলকুমার আচার্যের শরীর এখন ভাল নেই। তিনি আমার পরম প্রিয়। Adair Duttএর গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, তাঁর দাদা ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, নিখিল সেন, জ্ঞান মুখার্জি, মেট্রোপলিটনের অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল অচ্যুত দত্ত, ডাঃ পুলিন সরকার, ডাঃ সহায়রাম বসু, আমার বান্ধব। আমার এক সহপাঠীর ছোট ভাই হরিশ্চন্দ্র সিংহ এখন ফলতায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে আছেন। ইনি আমার কৈশোর যৌবনের প্রিয়সাথী। প্রশান্ত মহলানবীশ আমার উপরে পড়তেন। তাঁর সহধর্মিণী নির্মলাকুমারীও আমাকে ভালবাসেন। ৺ধূর্জটি আমার বন্ধু। আমি তাঁকে ইতিহাস শিখিয়েছিলাম! তা কি করে হবে? লিখেছে নাকি? দেখিনি তো!'

'ঢাকায় ছিলেন বন্ধু সহকর্মী ভবানীচরণ গুহ, সতীশ খাস্তগীর। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের ডিপুটি

সেক্রেটারী প্রমথনাথ সেনগুপ্ত আমার ছাত্র। 'বিশ্বপরিচয়' রবীন্দ্রনাথ আমাকে উপহার দিয়েছেন। তার আগে আমি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। প্রমথ সঙ্গে ছিল। সত্যব্রত সেন আমার ছাত্র, আমার পরম উপকারী প্রিয় বান্ধব। আমার পরিবারের বিপদে আপদে অনেক করেছে এই সেবা-পরায়ণ ছেলেটি। কোথায় আছে, তাও জানিনে।' [১৫ই মে, ১৯৬২]

মেয়ে এসে বললেন, 'গাড়ী এসেছে।' অমনি উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—'কাল স্টকহোল্ম যাচ্ছি, মনোরঞ্জন। সেখানে শান্তি-সম্মেলন হবে। প্লেনের টিকিট সংগ্রহের জন্য যেতে হবে এখনই।' তলা দিয়ে একটা ট্রাউজার্স চড়িয়ে উপরের লুঙ্গিটা ফেলে দিলেন, খালি গায়ের উপরে দিলেন একটা পাতলা ছোটহাতা কোট; পায়ের কাছে যে জুতাটা ছিল, তাই-ই যথেষ্ট; দেড় মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে গেলেন এই ভারি ওজনের মানুষটি সেই সুদূর দেশের বান্ধবদের আমন্ত্রণ রক্ষায় যাবার আয়োজনে, যেখানে দেশবিদেশের পৃথিবীযশা পণ্ডিতেরা আমন্ত্রিত হয়ে জগতের কল্যাণ ও শান্তি বিধানের জন্য সমবেত হচ্ছেন।

ফলতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের অধিবাসী ভক্ত হরিশ্চন্দ্র সিংহ মহাশয় এক মনোজ্ঞ বিবরণ পাঠিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করেছেন। তা হতে উদ্ধার কর্ছি।

"১৯০৯ সনে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ হিন্দুস্কুল হতে ও আমার অগ্রজ সুবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ডাঃ যোগীন্দ্রচন্দ্র সিংহ হেয়ার স্কুল হতে পাশ করে উভয়েই প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হলেন; বসু

I. Sc. ও সিংহ আই. এ। কিন্তু উভয়েরই গণিত পাঠ্য। তা তখন এক সঙ্গেই পড়া হত।"

" প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষক ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র, ডাঃ সি. ই. কালিস, ডাঃ ডি. এন. মল্লিক, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি।

অগ্রজের কাছে শুনেছি, বসু বাল্যকাল হতে অদ্ভুত প্রতিভা ও দুরন্তপনার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। Mechanics এর Force × Distance Workএর সংজ্ঞাটি বোঝা সত্ত্বেও না-বোঝার ভান করে অধ্যাপকের সঙ্গে তুমুল তর্ক করলেন। বললেন, 'ভারি পাথর ঠেলে ঠেলে আমি ঘর্মাক্ত, তবু পাথর নড়েনি বলে কি work হল না?' স্বভাব অনুযায়ী উনি হয়তো ঐ তত্ত্বকে অন্য দিক্ দিয়ে প্রমাণ করা যায় কি না, তারি সন্ধান করেছিলেন।

তাঁর দৌরাত্ম্যের কথা হিন্দুস্কুলের প্রধান শিক্ষক রসময় মিত্রও (রায় বাহাদুর) জেনেছিলেন। তাই যাঁরা শিক্ষণ-পদ্ধতি শিখ্তে আসতেন, তাঁরা যাতে ক্লাসের শৃঙ্খলা রাখতে অভিজ্ঞ হন, এজন্য হিন্দু ও হেয়ার স্কুল হতে বেছে যে সব ছাত্র দিয়ে তাদের জন্য ক্লাস গঠন করা হত, তাদের মধ্যে মিত্র মহাশয় সত্যেন্দ্রনাথকেও রাখতেন।"

"সত্যেন্দ্রনাথ আমার অগ্রজের সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে আসতেন। আমি তখন তাঁদের দুই ক্লাস নীচে পড়ি। বললেন, 'আমাকে তুমি বলবি; সাহস হয়নি, কিন্তু তিনি সজোরে কান মলে আমাকে তুমি বলালেন।

দেখেছি, এক এক সময় এক এক বিষয়ে তাঁর রোখ চাপে। তখন কিছু দিন ধরে অনন্যকর্মা হয়ে তাই-ই চলে। নূতন ক্যারম খেলা শেখার সময় দিন রাত্রি সমানে তাই চলল। মা বললেন, 'তুই এবার I. Sc. ফেল করবি'। সে পরীক্ষায় প্রথম হলেন। পরীক্ষার পূর্বদিন সন্ধ্যাবেলা Hall and Knight এর Higher Algebra নিয়ে বসলেন, I. Sc'র পাঠ্য সব অঙ্ক (অনেকগুলি খুব কঠিন ছিল) শেষ করে রাত্রি ৩টায় উঠলেন।"

পড়াশুনার সাথে সাথে সমাজসেবার দিকে সত্যেন্দ্রনাথ মনোনিবেশ করেছিলেন। এই কাজে হরিশ্চন্দ্র সিংহ প্রথম জীবনে তাঁর কাছেই হাতেখড়ি পেয়েছিলেন। তাঁর প্রদত্ত বিবরণ হতে কৃতজ্ঞচিত্তে আহরণ করছি।

"সে সময়ে শ্রমজীবীদের দিবসের কার্যাবসানে সন্ধ্যাবেলায় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কয়েকটি নৈশবিদ্যালয় পরিচালিত হত (এখনও হয়)। তাদের কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিত-অধ্যাপক ডাঃ ডি. এন. মল্লিক। সত্যেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় আমাদের পাড়ার মাণিকতলা নৈশবিদ্যালয়ে আমি পড়াতাম। এটর্নী অসীম-কৃষ্ণ দত্তও পড়াতেন। সত্যেন্দ্রনাথই আমাকে এই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ ও কেন্দ্রীয় সমিতির সভ্য করেন। ৺সত্যানন্দ রায়,যিনি পরে কলকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা-অধি-কর্তা হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় সম্পাদক। তাঁদের Nursing Brotherhood নামে যে আর্তত্রাণ-সমিতি ছিল,

তাতেও আমরা যুক্ত হলাম। এই সব কাজে ও সমিতির সভায় বক্তৃতা দানে অগ্রজতুল্য সত্যেন্দ্রনাথ আমাকে অনুপ্রাণিত করতেন এবং কাজ ও বক্তৃতার অযথা প্রশংসা করে উৎসাহিত করতেন—কলেজের পড়ায় উৎসাহ ও সাহায্য দানের সঙ্গে সঙ্গে।”

হরিশ্চন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির লেকচারার ছিলেন। স্ট্যাটিস্টিক্যাল বিষয়ে তাঁর গবেষণা সুন্দর হত। তিনি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অনেকদিন অবৈতনিক সম্পাদক হয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রবয়সের সবটাই জুড়ে আছেন সত্যেন্দ্রনাথ—অনুপ্রেরণায়, শিক্ষণে ও উৎসাহদানে। এই কথা হরিশ্চন্দ্র কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের বাল্যকালের বর্ণনার সময়ও তাঁকে আচার্য বসু ব'লে বারংবার উল্লেখ করে বলেছেন, “তিনি যে আমার পক্ষে কী, তার বর্ণনার ভাষা খুঁজে আমি পাই না।”

“প্রথম প্রথম আমার পড়াশুনায় নজর খুব দিতেন না। তবে মনে আছে, Workman's Tutorial Arithmeticএর শেষ দিকের কঠিন সমস্যার অঙ্ক কিছু কিছু করিয়েছিলেন। খুব কঠিন ; আই সি এস. পরীক্ষায় তা দিতে দেখেছিলাম।

1. Sc.র Chemistry, Physics ও Mathematics, তিনটি বিষয়ই তিনি আমাকে পড়িয়েছিলেন। পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও অন্য বই পড়তে দিতেন। Loney ছাড়াও Todhunter, K. P. Bose ছাড়াও Hall and Knightএর Algebraর কঠিন কঠিন অঙ্ক কষাতেন। ‘Conversation in Chemistry’,

'Analytical Geometry' ও 'Calculus' I. Sc.তে পাঠ্য ছিল না। তাও পড়িয়েছিলেন, এগিয়ে রাখার জন্য, তাই-ই পছন্দ করতেন।

M. Sc.তে তাঁর মত Applied Mathematics পড়ব, আর Physicsএ গবেষণা করার ইচ্ছা জেনে তিনি আমার B. Sc.র সময়ই Pure Mathematics বেশী করে পড়িয়ে দেন—কারণ, তাই হল গবেষণার চাবিকাঠি।

M. Sc. পড়া আরম্ভ হবার কয়েক মাস পর ১০ই জানুয়ারী, ১৯১৬, Defence of India Act অনুসারে আমাকে গ্রেপ্তার করে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার চন্দ্রনাথ পাহাড়ের অস্বাস্থ্যকর পাদদেশে নির্জন কারাবাসে রাখাহয়। সেখানেছুমাসঅসুস্থ থেকে স্বগ্রাম পোড়াদহে ছুবছর অন্তরীণ থাকি। মুক্তি পেয়ে ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হই। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য কিছু পড়ার সুযোগ ছিল না। পরীক্ষার মাত্র এক বৎসর বাকী। দুস্তর সাগর। এই অসহায়কে আচার্য বসু আবার স্নেহচ্ছায়ায় গ্রহণ করলেন। রাতদিন পড়াতেন। তাঁর চশমার পাওয়ার সাত। এজন্য বুকের নীচে বালিস দিয়ে মাছুরে শুয়ে আমাকে পড়াতেন। কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে তিনি যে Special Paper পড়াতেন, আমার তা ছিলনা। আমি নিয়েছিলাম অন্য বিষয়। তাও তিনি জলের মত করে আমাকে পড়াতেন। সবতাতেই তাঁর সমান ব্যুৎপত্তি।"

সত্যেন্দ্রনাথের নানা বিষয়ের প্রতি যে আগ্রহ ও

শ্রদ্ধাশীলতা, তা তাঁর ছাত্র বয়স হতেই উন্মেষিত হয়েছিল। হরিশ্চন্দ্র সিংহের প্রদত্ত মূল্যবান্ বিবরণী হতে জানা যাচ্ছে—

"I. Sc. ক্লাসে যখন পড়ি, তখনই স্বামী বিবেকানন্দের Science and Philosophy of Religion' ও অন্যান্য বই এবং স্বামী রামতীর্থ প্রণীত কয়েকখানি বই পড়িয়েছিলেন। কয়েক বার আমাকে ও কয়েক জন বান্ধবকে সঙ্গে করে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ 'মনীষা' নামে এক হস্তলিখিত পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। তাঁর বন্ধু ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য প্রভৃতি এতে লিখতেন। সত্যেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় অনেকে লিখতেন। আমাকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন Marcus Aurelius সম্বন্ধে। তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে, সবই বলে দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের লেখা অনেক ইংরাজী বাংলা প্রবন্ধ এতে ছিল' কবিতাও ছিল। একটির একটি লাইন মনে আছে—

The saddest heart may pleasure take
To find all nature smile so gay ;

নানা ভাবে তিনি আমার চিত্ত সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করতেন। আমাদের উভয়েরই প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রেয় (পরে রাজশাহী কলেজ ও ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ; সুন্দর কবিতা লিখতেন)। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীতজ্ঞ

দিলীপকুমার রায় প্রভৃতির গৃহে আমাকে নিয়ে যেতেন। কথাবার্তায় জ্ঞানলাভ হত। সেখানে দেখতাম, আচার্য বসুর আলাপে সবাই খুশী হতেন, অনেক তত্ত্ব ও তথ্য পাওয়া যেত। তাঁর কথায় একটা সরল বুদ্ধিমত্তা দেখতাম।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র গ্রীষ্মাবকাশে কখনও কখনও কার্মাটারে যেতেন। সাঁওতালদের বলিষ্ঠ দেহ দেখে এসে সুখ্যাতি করতেন। বলতেন, 'তোরা সাঁওতাল রমণী বিয়ে কর। তোদের যে সন্তান হবে, তারা তোদের মস্তিষ্ক ও তাদের দেহ নিয়ে জন্মালে দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে।' আচার্য বসু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'আর যদি আমাদের শরীর ও তাদের মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মায় ?'

শিষ্যের এই তুরন্ত যুক্তিতে গুরু আচার্য রায় আনন্দে হাসতে লাগলেন।"

এদেশের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রাচীনতম ব্যবসায়ী বিখ্যাত আডেয়ার দত্ত কোম্পানীর কর্ণধার গিরিজাপতি ভট্টাচার্য মহাশয় স্কুল ও কলেজে সত্যেন্দ্রনাথের এক ক্লাস নীচে ছিলেন। ইনি তাঁর পরম বান্ধব। গিরিজাপতি 'পরিচয় পত্রিকা' সৃষ্টিকারী পরিচয় গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তিনি সহৃদয়তাপূর্বক সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার ব্যবহারের জন্য যে স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন, তা হতে সার মর্ম দিচ্ছি—

"সত্যেন্দ্রনাথ তখন হিন্দুস্কুলে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র—আমি তাঁর নীচের ক্লাসের। স্কুলের অভিনয়ে প্রথম শ্রেণীর ছাত্ররা পার্ট পেত না। আমরা পেয়েছিলাম। Merchant of Venice

ও 'প্রতাপ সিংহ' হতে দুটি দৃশ্য অভিনয় হল। আমার দুটিতেই পার্ট ছিল। সে যুগের স্বাভাবিক দূরত্ব এড়িয়ে, নীচের ক্লাসের ছাত্র আমি—সত্যেন্দ্রনাথ আমার সঙ্গে আলাপ করলেন, আমাকে অভিনন্দিত করলেন। তার পর আমাদের বাড়ীতে এসে আমাদের পরিবারের সঙ্গে মিশে গেলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন খুব; পায়ে হেঁটে বালীগঞ্জ চলে যেতেন, যেতেন শোভাবাজারে হারিতকৃষ্ণের বাড়ী—সেখানে গান হত—কবিতা পাঠ হত, জ্ঞান-বিজ্ঞানও আলোচিত হত। হারিতকৃষ্ণের পিতা আমাদের এসব পছন্দ করতেন। প্রাগ্ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তও আলোচিত হত।"

"আমাদের বাড়ীতেও সম্মিলিত হতেন রবীন্দ্র বাঁড়ুজ্যে, স্বর্গত প্রফেসর হরিপদ মাইতি, আমাদের আত্মীয় কবি ভূপাল ভট্টাচার্য, সত্যেন, রজনী পালিত, হারিতকৃষ্ণ, প্রমথ মিত্র প্রভৃতি। পরে সত্যেন্দ্রনাথ নীরেন, হরিশ ও ধূর্জটিকে নিয়ে এলেন। আড্ডা বসলে রাত্রি পর্যন্ত চলত। সত্যেনেরই উৎসাহে এই আড্ডা হতে হাতে-লেখা ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'মনীষা' প্রকাশ করা হত। ৩ সংখ্যা বেরিয়েছিল। সত্যেন, চণ্ডীদাস, ভূপাল দাদা, হরিপদ, তারকদাস, প্রমথ মিত্র, রজনী পালিত, পূর্ণ সেন ও আমার লেখা ওতে ছিল। আমরা সত্যেন্দ্রনাথকে সম্পাদক করেছিলাম।

আমাদের বাড়ীতে শিল্পী যামিনী রায়কে ধরে আনা হয়েছিল। সেখানেই তাঁর ষ্টুডিয়ো হল। অনেক ছবি আঁকা হল।

সত্যেন্দ্রনাথ এসে দেখতেন, তুলির আঁচড়ে কেমন করে মনের ছবি ফুটে ওঠে।

পড়াশুনায়ও খুব ঝোঁক। রাত্রে রেড়ির তেলের প্রদীপে পড়তেন! নিজের ক্লাসের বই আগেই পড়া হয়ে যেত। এণ্ট্রান্সের সময় I. Sc.র বই, I. Sc.র সময় B. Sc.র বই শেষ করে রাখতেন। বাইরের বইও পড়তেন অনেক। টেনিসনের In Memorium হতে অনর্গল মুখস্থ বলতেন; কালিদাসের মেঘদূত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব শেষ হয়েছিল; গ্যারিবল্ডি ও ম্যাট্‌সিনি, Gibbon's Decline and Fall of The Roman Empire পড়ে আমায় পড়তে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। আর তাঁর প্রিয় ছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান। জনবিরল হেদুয়ার তীরে বসে মধুর কণ্ঠ ও ভাবে হারিতকৃষ্ণ, প্রফুল্ল চক্রবর্তী প্রভৃতি কত গান করতেন।

গণিতে সত্যেন্দ্রনাথের অদ্ভুত দক্ষতা। ১১টি প্রশ্ন, ১০টি উত্তর দিতে হবে। সত্যেন্দ্রনাথ ১১টিরই নির্ভুল উত্তর লিখলেন। তদুপরি জ্যামিতির এক-একটি প্রতিপাদ্য ৩।৪ রকম পদ্ধতিতে করে দেখালেন। খাতার পরীক্ষক অধ্যাপক উপেন্দ্র বকসী ক্লাসে এসে বিষয়টি সকলকে জানান এবং বলেন যে, এজন্য তিনি সত্যেন্দ্রকে ১০০ মধ্যে ১১০ দিয়েছেন।

M. Sc. পাশ করার পর গণিতাধ্যাপক ডি. এন. মল্লিক সত্যেন্দ্রনাথকে এক সার্টিফিকেট লিখে দেন—'অনেক কীর্তিমান্

ছাত্রকে পড়াবার সৌভাগ্য হয়েছে—তার মধ্যে সর্বোচ্চ হলেন সত্যেন্দ্রনাথ।—যার শিক্ষকতা করে নিজেকেই ধন্য মনে করি।' (মর্ম)

সত্যেন্দ্রনাথ আমাকে অনুশীলন সমিতি ও নৈশ বিদ্যালয়েও নিয়ে গিয়েছিলেন। নৈশ বিদ্যালয়ের কথা হরিশ্চন্দ্র বলেছেন। 'অনুশীলন সমিতি' বোমার যুগের। সেখানে লাঠিখেলা, ছোরা খেলা, তলোয়ার খেলা শেখান হত। উচ্চ স্তরে গোপনে পিস্তল ছোড়া প্রভৃতিও শেখান হত। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ওপরওয়ালাদের কয়েক জনের আলাপ পরিচয় ছিল।

হারিতকৃষ্ণের বাড়ীতে আমরা যখন গানবাজনাদি করতাম, তখন দাদা একটা পিয়ানো বাড়ীতে কিনে আনলেন। পিয়ানো সহযোগে প্রথমে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও তা হতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চর্চা শুরু হল। এই সূত্রে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান হতে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গীতসূত্রসার' কিনে আনলাম। সেটি ছিল ও-বইএর শেষ কপি। মহা উৎসাহে সত্যেন্দ্রনাথ সঙ্গীত-বিজ্ঞানে মনোনিবেশ করলেন। নূতন সুর উদ্ভাবন করতে হবে। অনেক অদ্ভুত অপরূপ সুর সৃষ্টি হল। ৺অনন্ত চক্রবর্ত্তী দাদার খুড়শ্বশুর, আবার সত্যেন্দ্রের সহপাঠী। তিনি এস্রাজে ওস্তাদ। তাঁর সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ যন্ত্রটি তিনি সত্যেন্দ্রকে উপহার দিলেন। সত্যেন্দ্রের হাত হল মিঠা। আজও সে যন্ত্র আছে। তিনি অবসরমত তা বাজিয়ে আনন্দ পান। তার পরবর্তী কালের গুরু আইনষ্টাইনও বেহালা বাদনে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

এসব হল স্কুল-কলেজের পড়ার বাইরের কথা, খেলা ও বাইরের চর্চা। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবে পড়াশুনার ক্ষেত্রে আমরা কেবল সিলেবাসে আবদ্ধ থাকতাম না। স্কুলে পড়ার সময়ই ম্যাকমিলানের দোকান হতে S. P. Thompsonএর Electricity কিনে আনলাম। সে বই পড়ে সত্যেন বললেন, ব্যাটারী করতে হবে। Zinc, Carbon, নিশাদল প্রভৃতি যোগাড় করে কাদা দিয়ে ব্যাটারী তৈরি করে তা পুড়িয়ে ব্যাটারী তৈরি করলাম। তা হতে টর্চে আলো জ্বালিয়ে আমাদের কত আনন্দ। টেলিস্কোপও আমরা বানিয়েছিলাম। তার বিবর্ধনক্ষমতা হয়েছিল ১৫-১৬ গুণ। পেতলের পাতের চোঙ্গা বানিয়েছিলাম, আর চশমার দোকান হতে লেন্স সংগ্রহ করেছিলাম।

সত্যেন্দ্রনাথ একদিন বল্লেন, 'এসো, কয়লার গ্যাস করি।' ছোট্ট হাঁড়িতে পাথুরে কয়লা; মাটি দিয়ে মুখ বন্ধ। ছেঁদা করে তাঁতে পেঁপের নল সংযুক্ত করা হল। হাঁড়ির নীচে আগুন দিতেই পেঁপের নলের প্রান্তে এলো গ্যাস। দেশলাইর কাঠি জ্বেলে ধরতেই সে গ্যাস জ্বলে উঠল। সে দিনও আনন্দে অধীর হয়েছিলাম।

কলেজে পড়ার সময়ও সত্যেন্দ্রনাথ পড়াশুনার ব্যাপারে সকলকে সহায়তা করতেন। অদ্ভুত তাঁর বন্ধুপ্রীতি ও প্রতিভা। যখন কলেজে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি, তখন Statics (বলবিদ্যা)র একটি সম্পাদ্যের প্রতীক (মডেল) তৈরিতে বাসনা হয়। আমি যা তৈরি করি, তা আমার মনঃপূত হয় না; একটা ত্রুটি

থেকে যায়। সত্যেন্দ্রনাথের সাহায্য চাই। তিনি একটা মতলব দেন। তদনুযায়ী মডেলটি সংশোধন করি। সুবিখ্যাত গণিতবিদ্ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক Cullis সাহেব সেটি দেখে বিস্ময়ে অধীর হয়ে ওঠেন। মডেলটি হাতে নিয়ে চতুর্দিক্ হতে দেখতে থাকলেন, ঘরময় পায়চারি করলেন। মডেল তৈরি করা ছিল Cullis এর শখ। তাঁর ঘরে স্বকল্পিত অনেক মডেল জমা করা থাকত। তিনি বল্লেন, "কি উপায়ে তুমি এটি কল্পনা করেছ? স্যার আর. এস. বল অন্য উপায়ে এই মডেল তৈরি করে ও গ্রন্থরচনা করে F. R. S. হয়েছেন। স্বাধীন গবেষণার শক্তি তোমার আছে। এই সাধুবাদের অর্ধেক পাওনা সত্যেন্দ্রনাথের। এই মডেলটি পরের দিন হতে বহু বৎসর ক্লাসে বিষয়টি বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হত।

'ঘোষবিধি' প্রকাশের আগে জ্ঞান ঘোষ সত্যেন্দ্রনাথকে বিষয়টি দেখিয়ে নিয়েছিলেন। আমি তখন সেখানেই ছিলাম। 'ঘোষবিধি' পরে অপ্রচলিত হয়। কিন্তু তাঁরই উদ্ভাবিত সঙ্কল্পগুলি ও পন্থা অনুসরণ এবং পরিমার্জিত করে Debye তাকে পরিবর্তিত রূপে প্রকাশিত করেছেন।"

"ঢাকায় থাকাকালে সত্যেন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'বোস-সমষ্টিক বিধি' গবেষণাটি রচিত হয়। সেটি তিনি লণ্ডনে Phil. Magazineএ পাঠান। বহুদিন পর্যন্ত তাঁদের কাছ হতে ভালমন্দ কোন খবর আসে না। তখন তিনি সাহস করে আইনষ্টাইনকে পাঠান। তিনি সেটিকে আদৃত করে অবিলম্বে চিঠি লিখেন। বলেন, সত্যেন্দ্রনাথ-প্রদত্ত এই বিধিটি বিজ্ঞানে কণিকা-সমষ্টির

আচরণ সমাধানে গ্রহণযোগ্য ও তিনি স্বয়ং এই বিধিটি সাধারণ গ্যাসের সূত্র সন্ধানে প্রয়োগ করেছেন ; গবেষণা-প্রবন্ধটিতে তাঁর এই প্রয়োগ যুক্ত করে তা একত্রে প্রকাশ করবেন।

বিষয়টি হল জ্যোতিঃকণার তাপ বিকিরণ সম্পর্কে। লর্ড রেলে, বোল্‌ৎজম্যান প্রভৃতি বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা এক একটি সূত্র প্রস্তাব করেন। অবশেষে প্লাঙ্ক একটি সূত্র রচনা করেন, যা হয় প্রত্যক্ষের অনুকূল। এই সূত্রে উপনীত হতে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, জলস্রোত যেমন জলবিন্দুর সমষ্টির প্রবাহ, তেমনি তাপের বিকিরণ হল তাপকণিকার প্রবাহ—তা নিরবচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু প্লাঙ্ক নিজেই এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন না। আইনষ্টাইন কিন্তু শক্তিকণা সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে নিলেন ও আলোককেও সেই পর্যায়ের অন্তর্গত করলেন। অর্থাৎ আলোক-রশ্মিও আলোক-কণা হতে উদ্ভূত। যাকে মনে করা হত, বস্তু নয়—তরঙ্গ, তাও হল কণিকাসমষ্টি, আলো পরাণু-সমষ্টি। শক্তি ও আলোর ক্ষেত্রে পরাণুবাদের অভ্যুদয় হল। বিজ্ঞানীরা আরও গবেষণার দ্বারা প্লাঙ্ক-সূত্রকে সুসঙ্গত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টিত হলেন। সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণা আলোপরাণুর (Photon) প্রসঙ্গক্রমে প্লাঙ্কের সূত্রকে স্বাধীন ও সংশয়শূন্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত করল। আইনষ্টাইন এটিকে আদর করলেন। জানালেন যে, রীতিটি সুধু শক্তি ও আলোক-কণিকার ক্ষেত্রে নয়, বস্তুত অন্যান্য ভৌতিক কণিকা-সমাবেশেও প্রযোজ্য। উদাহরণ স্বরূপ তিনি গ্যাসের আচরণ নিরূপণ করতে ঐ রীতি প্রয়োগ করলেন।

এই ভাবে আইনষ্টাইন কর্তৃক স্বীকৃত ও অভিনন্দিত হওয়াতে বিজ্ঞানজগতে এটি 'বোস-আইনষ্টাইন সমষ্টিক বিধি' নামে পরিচিত হল।...শত সহস্র কোটি তারার আলোক ও তাপ বিকিরণের রহস্যানুসন্ধান বিজ্ঞানের সেরা কাজ। বোস কর্তৃক কণিকা সমাবেশের সমষ্টিগণিত প্রবর্তিত হওয়াতে বিজ্ঞানের অগ্রসরণ হল।"

বৈজ্ঞানিক গিরিজাপতি ভট্টাচার্য 'পরিচয়' পত্রে (১৩৩৯, কার্তিক) 'বসুর সামষ্টিক গণিত,' ও ১৮৭৯-৮০ শকের মাঘ-চৈত্র সংখ্যার 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় 'বোস-আইনষ্টাইন পরিসংখ্যান'—দুটি প্রবন্ধে বাংলাভাষীদের নিকট বসুর তত্ত্ব গোচরীভূত করেছেন। উপরোক্ত উদ্ধৃত লেখায় তাঁর পটু হাতে বিষয়টি আরও সহজে প্রকাশিত হয়েছে। তাই এটি এখানে ভুক্ত করে রাখা কর্তব্য মনে করলাম।

সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু ৺ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মেজ ভাইয়ের মৃত্যু হল তাঁর ইতিহাসে এম. এ. পরীক্ষার ঠিক আগেই। ভ্রাতৃশোকে নিজে পড়তে পারতেন না—ছোট ভাই বই পড়ে শোনাতেন। ইজিপ্টের ইতিহাসের একটা অংশ তাঁর গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। "একদিন সকাল বেলা সত্যেন এসে হাজির...বল্লে, দে আমাকে। সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে জিনিষটা ঠিক করে দিলে...পরীক্ষার পর গৌরাঙ্গবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আশ্চর্য হয়েছি খাতা দেখে—আমার ক্লাসে আসতে না, Ancient East পড়েছো বলে মনে হয় না। অথচ লেখা-

গুলি বেশ ভালই হয়েছে।' উত্তর দিলাম, 'সত্যেন পড়িয়ে দিয়েছিল।' 'ও, সত্যেন! তাই বল!'

'তার সবটাই মাথা। দেখেছি কিন্তু বেশী হৃদয়বৃত্তির। কত লোককে অজানিতে টাকা দিয়েছে, মুখে মুখে পড়িয়ে দিয়েছে; কত উপায়ে অন্যকে সাহায্য করেছে, কেউ বিপদে পড়লে তাঁর চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে, বন্ধুর ভাই যক্ষা রোগে বেশ্যাবাড়ীতে পড়ে আছে, তাকে হাসপাতালে তুলে এনেছে, বন্ধুর বাড়ীতে ছোট ছেলে মেয়ে দেখলে আপন করে নিয়েছে।

লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বারাণসী, দিল্লী, বোম্বাই প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পণ্ডিত আর তথাকথিত পণ্ডিত দেখেছি। দুএকজন ছাড়া সবাই পলিটেসিয়ান—হৃদয়ের অব্যবহার আমাদের স্বভাবে খুবই চোখে পড়ে।—কারণ, বর্তমান যুগে দায়িত্বহীনতার বদলে সমাজ যেন অধিকার-প্রমত্ত হয়েছে এবং অধিকারের অর্থই হোল শক্তি, পাওয়ার অর্থাৎ পলিটিক্স। সত্যেনের মধ্যে পাওয়ারের তিলমাত্র আকর্ষণ নেই। সে বিদ্যাবুদ্ধি আর হৃদয় নিয়েই কাটিয়ে গেল।' [ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-লিখিত 'ঝিলিমিলি'—২২।৯।৫৯—'অমৃত' হতে আহৃত]

অধ্যাপক ৺ধূর্জটিপ্রসাদের কলমে তাঁর বন্ধুর ছবি সুন্দর ফুটে ওঠে। তাই উপরোক্ত লেখা হতেই উদ্ধার করে নিম্নলিখিত বিবরণটি দিচ্ছি।

"সে বার Indian Science Associationএর বাৎসরিক সভায় (Indian Science Congress, দিল্লী অধিবেশন, ১৯৪৪ সন) সভাপতিত্ব করছে। সন্ধ্যায় ভারতবর্ষের লাট

সাহেব ওয়াভেল সাহেব সকলকে খানা দিলেন। সে দিনকার সত্যেনই প্রধান অতিথি, আশা করেছিলেন সে এসে পৌঁছবে। রাত ৯টা পর্যন্ত এলো না।—তার পরও নয়। ব্যাপারটা হয়েছিল এই—দুপুর বেলা একজন পুরাতন স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে দেখা; তারই সঙ্গে টাঙ্গা চড়ে তার বাড়ি হাজির, এবং সেইখানেই সারাদিন সে আর তার স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করল, রাত্রে খেয়েও এলো। ওয়াভেল সাহেবের সাথে আর দেখা হল না।

পরের দিন লেডি ওয়াভেল জিজ্ঞাসা করলেন, কি হোল Sailor boy! এলে না কেন? আমরা সব তোমার জন্য বসেছিলাম। আমতা আমতা করে একটা জবাব খাড়া করলে। সে কদিন কলকাতার চাঁদনী-থেকে-কেনা একটা টুপি সারা-দিন মাথায় পরে ছিল। জামা-কাপড়েরও সেই দশা। জ্ঞান মুখুজ্জে খবরটা দেয়।

এই রকম স্বাভাবিক ভাবে অস্বাভাবিক ব্যবহার করত—এখনও করে। স্বভাবটাই মেয়ে মানুষের—কিন্তু ন্যাকামি বরদাস্ত করতে পারে না।”

কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা ও গবেষণা, দ্বিতীয় বার

১৯৪৪ সনের অক্টোবর মাসে ৫১ বৎসর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিদ্যার খয়রা অধ্যাপক হয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। এখানে লেকচারার থাকা কালে ১৯২১ সনে ২৭ বৎসর বয়সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের রিডর হয়ে সেখানে চলে গিয়েছিলেন। তখন নোবেল প্রাইজবিশ্রুত রমন ছিলেন এখানে এই বিভাগের কর্তা। ফিরে এসে দেখলেন, ইতিমধ্যে রসায়ন বিভাগে যত কাজ হয়েছে, বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ হয়েছে, তার তুলনায় পদার্থ-বিজ্ঞানের সর্ববিষয়ে তত উন্নতি হয়নি।

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের নানা ক্ষেত্রে সম্মিলিত প্রয়োগের দ্বারা শিল্প ও জ্ঞানের বিবিধ উন্নতি সাধিত হয়েছে। তিনি চিন্তা ও প্রয়োগের দ্বারা গবেষণা-ক্ষেত্রে এইটিকে পূর্বাপেক্ষা বেশী উৎসাহ দিলেন।

১৯৪৫ হতে ১৯৫৬ সন পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞান কলেজে ছিলেন। ১৯৫৮ সনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এমেরিটাস প্রফেসর নির্বাচিত হন। তাঁর এই দ্বিতীয় বার বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপকতা করার সময় তাঁর সঙ্গে কাজ করেছিলেন শিবব্রত ভট্টাচার্য, কমলাক্ষ দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র দত্ত, জগদীশ শর্মা, লীলাবতী রায়, পূর্ণিমা সিংহ প্রভৃতি।

অধ্যাপক বসু, রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী

জোড়াবাগান অঞ্চলের যে নর্মাল স্কুলে রবীন্দ্রনাথ ছেলে-খেলায় পড়েছিলেন সেই স্কুলেই সত্যেন্দ্রনাথ হয় তো বছর ত্রিশেক পরে ছাত্র ছিলেন। তখন এঁদের দেখা হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তারপর 'সবুজ পত্রের আড্ডায়' ও বিচিত্রা ভবনে এই দুই পুরুষের দেখা হয়েছে।

"সবাই যেমন যায়, আমিও তেমনি শান্তিনিকেতনে বেড়াতে যাই। তখন সেখানে আমার ছাত্র প্রমথনাথ সেন গুপ্ত বিজ্ঞানের অধ্যাপক। প্রমথ এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের ডিপুটি সেক্রেটারী। আমি যখন রবীন্দ্রনাথের কাছে যাই, তখন প্রমথ সঙ্গে ছিলেন। প্রমথ একখানা বই লেখেন। সেইটি রবীন্দ্রনাথ দেখেন এবং একখানা বই নিজে লিখতে আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ নিজের বই এর নাম দেন 'বিশ্বপরিচয়'। আমাকে দেখে দিতে বলেছিলেন। আমি রাজী হইনি। তিনি লিখেছেন,তাই আমাদের ভাগ্য। তাঁর লেখা আমি কি দেখব? পরে দেখলাম, 'বিশ্বপরিচয়' 'প্রীতিভাজনেষু' সম্বোধন করে তিনি আমার নামের সঙ্গে যুক্ত করেছেন! প্রমথ তাঁর বই, 'পৃথ্বীপরিচয়' পরে প্রকাশ করেছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথ এই বই লেখা, ছাপা ও ভ্রমসংশোধন ব্যাপারে প্রমথনাথ সেন গুপ্ত, রাজশেখর বসু, বশী সেন, বিভূতিভূষণ

সেন ও ইন্দ্রনাথ সোমের ঋণ স্বীকার করেছেন, প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকায়। রবীন্দ্রনাথ বিদেশী অনেক বইএর সাহায্য নিয়েছেন, কৃতজ্ঞতা সহকারে সে ঋণও স্বীকার করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ এঁদের মধ্যে ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ এ বই লিখেছিলেন ভগবানের সৃষ্টিলীলার বিচিত্রানুভূতিতে এবং সে দিকে হয় তো তাঁর চিন্তার দোসররূপেই তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে নির্বাচন করেছিলেন।

কবি-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানের প্রতি মমতা এ দেশের জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট নয়। কিন্তু আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনায় তাঁর কর্ম, বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধার সুন্দর নিদর্শন; তা কেবল বন্ধুকৃত্য নয়।

'বিশ্বপরিচয়ে'র প্রারম্ভে তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে যে দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন তা হতে উদ্ধার করছি—

"বিজ্ঞান চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিষগুলি কেবলি ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারি অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।...জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহজ বই পড়তে লেগে গেলুম...অনেক লেখকের অনেক বই পড়ে গেছি...তার পরে এক সময়ে সাহস করে ধরেছিলুম প্রাণতত্ত্ব—ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে

বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধ বিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে—অথচ কবিত্বের এলাকার কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে তা অনুভব করিনে।”

এই বিজ্ঞান-মনা রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট বিশ্বভারতীতে বিধিনিয়ন্ত্রিত যোগসূত্র অবলম্বনে 'বিশ্বপরিচয়' সৃষ্টির প্রায় ১৯ বৎসর পর ১৯৫৬ সনের ১লা জুলাই বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু উপাচার্য-পদে অধিষ্ঠিত হয়ে এলেন।

১৯১৬ সন হতে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর তিনি কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। বহু খ্যাতনামা অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্র। বিশ্বভারতীর পাঠ্য ও পঠনের তিনি যে ক্রমপরিণতি আবশ্যক বিবেচনা করলেন, সে কার্যক্রম (Scheme) বিশ্ব-ভারতীর পরিচালকসভা গ্রহণ করলেন। সেই কার্যক্রম অনুসরণ করেই ১৯৫৮ সনে ওখানে সাধারণ বিজ্ঞানের ক্লাস প্রবর্তিত হয়েছে; সম্পূর্ণ কার্যক্রম আজও অনুসৃত হয়নি। ১৯৫৮ সনেই ভারতসরকার অধ্যাপক বসুকে 'জাতীয় অধ্যাপক'-পদে বরণ করেন। তখন তিনি বিশ্বভারতীয় উপাচার্যের পদ পরিত্যাগ করলেন।

গ্রামোন্নয়নের যে কাজ রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে আরম্ভ করেছিলেন, তাঁর জীবদ্দশায়ই তা হতে নানা সুফল দেখা গিয়েছিল। শিক্ষা ছাড়াও এই কাজ সত্যেন্দ্রনাথের

স্বভাব-অনুযায়ী হয়েছিল। শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে এখানে যে নানা কারুশিল্পের প্রয়োগ ও শিক্ষণ চলেছিল, উনি গিয়ে দেখলেন, অতিশয় ব্যয়সাধ্য বলে পূর্বতন কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায় অনুযায়ী তার কিছুটা (ছুতার মিস্ত্রির কাজ) উঠিয়ে দেবার আয়োজন হচ্ছে। তিনি বিশ্বভারতীতে যে সব নবতর শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, তাতে সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিকেতনেরও নূতনতর কর্মের পথ উন্মোচিত হয়। এই ভাবে শ্রীনিকেতনের অবনতি রুদ্ধ হয়। গ্রাম, খাদি ও জনশিক্ষার জন্য সরকারের সাহায্যে অধ্যাপক বসু শ্রীনিকেতনে এক শিক্ষক-বিদ্যালয়ের প্রবর্তন করেন। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করে একটি সুন্দর শিক্ষণ-পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ-কৌশল প্রদর্শন করেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের অসীম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলতে হয়, অন্ধ বিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা তাঁকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা হতে অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে।

জ্ঞানের সর্বধারায় স্পৃহা

বাঙ্গালা সাহিত্য ও ভাষার রবীন্দ্রযুগের তরণী 'সবুজপত্রে'র কর্ণধার প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) সহকারী পবিত্র গঙ্গো-পাধ্যায়ের 'চলমান জীবনে' 'সবুজপত্রে'র শনিবারের আড্ডায় যাঁরা যেতেন, তাঁদের অনেকের নাম আছে—অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, সতীশচন্দ্র ঘটক, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ধূর্জটি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, হারিতকৃষ্ণ দেব, বরদাচরণ গুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন, "এঁরা সকলেই বাঙলার সংস্কৃতি-জীবনে প্রথিতযশা হয়েছেন। এঁরা যে কেবল সবুজ-পত্রের নিয়মিত লেখকই ছিলেন তাই নয়, এঁদের সকলকে নিয়ে রীতিমত একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। কেবলমাত্র লেখার মাধ্যমে নয়, চৌধুরী মহাশয়ের আড্ডার ভিতর দিয়ে এঁদের পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল নিবিড় ঐক্য। সাহিত্যিক গোষ্ঠী বলতে বাংলা দেশে এঁরাই বোধ হয় সর্বপ্রথম।···"

একবার দল বেঁধে তেওতা (ঢাকা জেলায়, কিরণশঙ্করের দেশে) যাবার প্রস্তাব হলো—···অনেকেই সোৎসাহে রাজী হলেন।···দল জুটেছিল কম নয়। চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং, ধূর্জটিপ্রসাদ, কুমুদশঙ্কর, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কিরণশঙ্কর বাবুর ছোট ভাই দেবশঙ্কর, এঁদের সঙ্গে আমিও ছিলাম।"

সত্যেন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রে' কিছু লেখেন নি। তিনি যে লিখনপটু, তা এই পুস্তকের অন্যত্র তাঁর লেখার উদ্ধৃতি হতেই দেখা যাবে। তবু তিনি খুব বেশী লেখেন নি। সবুজপত্রের আড্ডায় তিনি যেতেন বিবিধ ক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞানের পিপাসা মেটাতে ; এ তাঁর যৌবনকালের কথা। স্কুলের ছাত্র বয়সে যে ফরাসী ভাষা শেখা সুরু হয়েছিল, কলেজে পড়ার কালে তা ব্যবহারোপযোগী হয়েছিল। বীরবলের গ্রন্থাগার হতে অনেক ফরাসী বই এনে পড়ে পড়ে ফরাসী সাহিত্যের প্রতি তাঁর মমতা জন্মে। এই ফরাসী ভাষার জ্ঞান পরে ফ্রান্সে তাঁর কাজে লেগেছিল।

তার পর কলকাতায় সাহিত্যের যে আড্ডা প্রগতিশীলদের টানত, তা রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রা'। ঢাকা হতে কলকাতায় এলে, সুযোগ পেলেই সত্যেন্দ্রনাথ এই সভায় উপস্থিত হতেন।

* * *

একদিন বললেন, 'বিবেকানন্দের ভ্রাতা ডাঃ ভূপেন্দ্র দত্তের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে তুমি কি জান?'

তাঁর বিবিধ বইএর আলোচনা করলাম। তিনি যে প্রথম জীবনে বিপ্লবী ছিলেন, তাঁকে আমেরিকায় সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সে বিবরণ সম্বলিত বিপ্লবীদের ইতিহাসের একাংশের একটা অপ্রচলিত তাঁর বাঙ্গালা বইও যে সম্প্রতি আমার হাতে পড়েছিল, বললাম।

উনি চুপ করে থাকলেন। তার পর হঠাৎ বললেন, "বিপ্লব-বাদী ও সন্ত্রাসবাদীদের ক্রমপরিণতির ইতিহাস-বর্ণনাকারী এক চিত্র-প্রদর্শনীতে ছেলেরা নিয়ে গিয়েছিল গঙ্গার ও-পারে। এ-কালের ছেলেরা যে অনেক কিছু জানে না এবং ভুল জানে, সে-দিন তা বুঝেছিলাম। কারণ, সে কালে তাঁদের সঙ্গে যে আমার যোগ ছিল। তুমি তো জান, শৈলেন ঘোষ, অতুল ঘোষ প্রভৃতি আমার সহপাঠী বন্ধু ছিল।"

* * *

"বসন্ত মল্লিকের নাম শুনেছ? সে কালের জ্ঞানী, গুণী দার্শনিক? ইনি আমাদের বসন্ত দা; নিরহঙ্কার, পরহিতব্রত, প্রচারভীত আমাদের বসন্ত দা। এই দেখ তাঁর জীবনী। অক্‌সফোর্ডে ছিলেন, নানা দেশে বেড়িয়েছিলেন। হিন্দুর ধর্মে তাঁর আস্থা ছিল; জীবনের সঙ্গে তা মিলিয়েছিলেন।"

* * *

কোথায় দেখেছিলেন, আমি বেলওয়ার দুটি তাম্রশাসন (মহীপাল ও তৃতীয় বিগ্রহপাল) এসিয়াটির সোসাইটির মুখপত্র ও 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় সম্পাদনা করেছি। একদিন বললেন, 'আমাকে পড়াও।'

পড়ে বললেন, "এই কাজটি তোমার খুব ভাল হয়েছে। 'ফাণিত' অর্থ গুড়। তোমার এই তাম্রশাসনে উল্লেখিত ফাণিতবীথিকে তুমি যেখানে মানচিত্রে দেখাচ্ছ, সেই অঞ্চলে নিশ্চিত অনেক গুড় তৈরি হত এবং হয়তো এখনও হয়।"

বললাম, "এখনও হয়।"

দেশবিদেশের অনেক ইতিহাসের পণ্ডিতগণ 'বেলওয়া লিপি' সম্বন্ধীয় লেখাগুলির সুন্দর আলোচনা করেছেন ; কিন্তু কেহ-ই ফাণিতবীথি নামের অর্থের সূত্র ধরে এই ইঙ্গিত দেন নি, যা অধ্যাপক বসু দিলেন।

* * *

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর যে দিকে দিকে নবজাগরণের দীপ জ্বলেছিল— আমার লেখা বিজ্ঞানীদের জীবনীগুলির আলোচনায়, সে প্রসঙ্গ তুলে বললেন—

"সেই যুগকে ফিরিয়ে আনা যায় না ? সেই স্বার্থত্যাগী উন্নতমনা পরহিতব্রত মানুষ। সেই সমগ্র যুগটাকে অল্প কথায় এ যুগের মানুষের সামনে একটা বইতে তুলে ধরতে পার ?" বললাম, "অনেকের লেখা ভাল বই অনেক আছে ! পাঠক খুব কম।"

অধ্যাপক বললেন, "কিন্তু আদর্শ ও দেশের প্রতি মমতা না হলে যে সব যাবে।"

* * *

একদিন নিবেদিতার জীবনের শেষ অংশের একটা প্রায় অপ্রচলিত বিবরণ শুনে তিনি আমাকে বললেন, 'এ খবর তুমি জানলে কি করে ? এই দেখ, ফরাসী ভাষায় লেখা রোমা-রোলার 'ইণ্ডি' বইএর নূতন সংস্করণ। এতে দেখ, এই বিবরণই আছে।'

এই বলে চোখে চোখে ফরাসী ভাষায় লেখা সে অংশ পড়ে মুখে মুখে অতিদ্রুত ইংরাজীতে তা তর্জমা করে আমাকে শোনালেন। বললেন, 'তুমি শান্তিনিকেতনী; রবীন্দ্রনাথ ও রোমা রোলায় কয়েক বার দেখা হয়েছিল। বিস্তৃত সে বিবরণও এই বইএর নানা স্থানে আছে। শুনলে তোমার ভাল লাগবে।'

এই বলে পর পর দু দিন সকাল ৯টা হতে প্রায় ১১টা পর্যন্ত, একবারে একটুও না থেমে আমাকে উচ্চকণ্ঠে অতি দ্রুত তর্জমা করে শোনালেন, যেন তিনি বাংলায় লেখা বই পড়ে শোনাচ্ছেন। ইংরাজী বা অন্য ভাষায় বই পড়ে কেউ চেষ্টা করে দেখতে পারেন যে, এক এক বাক্য পাঠ করে শুধু সেই বাক্যটির তর্জমা করা সম্ভব। কিন্তু অবিচ্ছেদ তর্জমা মুখে মুখে বলা অমানুষিক কাজ।

সত্যেন্দ্রনাথের এই বিস্ময়কর কাজ ও এই বয়সে এই একটানা গুরু পরিশ্রম-ক্ষমতা আমাকে অভিভূত করল। যদি ফরাসী শিখে নিতে পারি, তবে তাঁর এই অমানুষিক স্বেচ্ছাবৃত পরিশ্রম হতে তাঁকে মুক্তি দেওয়া যায় ভেবে, বইখানি তুলে দেখলাম। বললেন, 'কি দেখছ? ফরাসী ভাষা শিখবে? দেখলে তো ইংরাজী ভাষার সঙ্গে কোন মিল নেই। আজ প্রায় ৪৫ বছর আমি ফরাসী পড়ছি, তাই পারছি।'

৫০ বৎসর ইংরাজী পড়ছেন, এবং এমনি দ্রুত মুখে মুখে অবিচ্ছেদ তর্জমা করছেন—সে তর্জমায় লিখন-যোগ্য বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াপদ ঠিক ঠিক স্থানে সন্নিবেশিত হয়ে অবিরল বাক্য নির্গত হচ্ছে—এমন মানুষ তো এখনও দেখবার সৌভাগ্য হল না।

* * *

আর একদিন বললেন, "তোমার চরক সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ছুটি পড়লাম। বেশ সহজ করেছ। চরক ও সুশ্রুত সহজ করে বই করা যায় না? ও তো আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র নয়। ও যে স্বাস্থ্য-ধর্ম-সম্পন্ন মানুষ-গঠনের শাস্ত্র। আমরা যে সব হারিয়ে ফেলব।"

বোগদাদের বিখ্যাত খলিফা-সম্রাট হারুণ-অল-রসিদ এ দেশ হতে আয়ুর্বেদ-বিশারদ কয়জনকে স্বদেশে নিয়ে গিয়ে চরক সুশ্রুত আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন। তিনি বিদ্যার পরিপোষক ছিলেন। গ্রীক পণ্ডিতদেরও কয়েকজনকে স্বদেশে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। সে হল অষ্টম শতাব্দীর কথা। এ প্রসঙ্গ উঠল।

অধ্যাপক বসু বললেন, "তোমার তো প্রাচীন জিনিষ খোঁজার অভ্যাস। যদি ঐ আরবী পুঁথি পাও, তবে তর্জমা করলে হয় তো দেখা যাবে, তা চলতি চরক সুশ্রুত হতে তফাৎ।"

কলকাতায় National Library ও Asiatic Societyতে সন্ধানে সফল হলেম না। ভারত সরকারের ইচ্ছা ও ব্যবস্থায়

পরম পণ্ডিত প্রিয়দারঞ্জন রায় মহাশয় বহু বৈজ্ঞানিকের সহযোগে ভারতের বিবিধ বিজ্ঞানের ইতিহাস লিখছেন। তিনি হায়দ্রাবাদে খোঁজ নিতে বললেন।

জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বললেন, 'যতটুকু বিবরণ পেয়েছ, সব আমাকে দাও। আমি ব্রিটিশ মিউজিয়মেও খোঁজ নেব।'

* * *

একদিন বললেন, "গঙ্গার মোহনা হতে ক্রমে পলি পড়ে চড়া এগিয়ে আসছে কলকাতার দিকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তোমরা জান, গঙ্গার জলে লবণের ভাগ ক্রমশ বাড়ছে। বর্ষায় কমে, শীতে খুব বৃদ্ধি পায়।

এখান হতে সমুদ্রে পৌঁছতে গঙ্গানদীর দুই তীরে অজস্র গ্রামে প্রচুর শস্যক্ষেত্র। জলে লবণ বাড়ছে, আর এই সব শস্যক্ষেত্র নষ্ট হচ্ছে। সবুজ রং হলুদ হয়, ক্রমে শুকিয়ে যায়। যে-গাছ যুদ্ধ করে বেঁচে থাকে, তার ফলন হয় সামান্য। আমি গঙ্গাতীরের গ্রামগুলিতে ঘুরে ঘুরে দেখেছি, থেকেছিও সেখানে।"

স্বদেশে ও বিদেশে বিবিধ সম্মান, উপাধি

I. Sc., B. Sc. ও M. Sc. পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার শ্রেষ্ঠ সম্মান তাঁর ছাত্র-বয়সের। গবেষণার দ্বারা আইনষ্টাইনের নামের সঙ্গে তিনি যুক্ত হলেন ২৯ বৎসর বয়সে। ৩৩ বৎসর বয়সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক হলেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের যখন গণিত ও পদার্থ-বিদ্যার তিনি সভাপতি হয়েছিলেন, তখন বয়স ছিল ৩৫। ১৫ বৎসর পর হয়েছিলেন মূল সভাপতি। ৫১ বৎসর বয়সে হয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক।

এ সব এবং অন্য কতক সম্মানের বিবরণ পূর্বেই যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে। স্বাধীন ভারতে বড় বড় অধ্যাপকদের ভারতীয় রাজ্যসভায় সভ্য মনোনীত করে সম্মানিত করা হয়। ১৯৫২ সনে সত্যেন্দ্রনাথ রাজ্যসভার সভ্য মনোনীত হলেন। তুই বৎসর পর (১৯৫৪) ভারত সরকার পদ্মবিভূষণ উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করেন।

১৯৫৭ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁকে ডক্টরেট উপাধি দেওয়া হল। এলাহাবাদ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও সেই বৎসরই তাঁকে ঐ একই উপাধি দিলেন।

পরবৎসর (১৯৫৮) 'রয়াল সোসাইটি অব লণ্ডন ফর প্রমোটিং ন্যাচারাল নলেজ' তাঁকে ফেলো নির্বাচন করেন। এই উপলক্ষে তিনি প্যারিস হয়ে লণ্ডনে যান। এই বৎসরই ভারত সরকার তাঁকে 'জাতীয় অধ্যাপক'-পদে বরণ করেন।

১৯৬১ সনে বিশ্বভারতী তাঁকে রবীন্দ্রশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে 'দেশিকোত্তম' উপাধি প্রদান করেন।

১৯৬২ সনে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনষ্টিটিউট সত্যেন্দ্র-নাথকে ডক্টরেট উপাধি দিয়েছেন।

এ সকল সম্মান তাঁকে গুরুভার করে দেয়নি ; মুক্তদ্বার, মুক্তহৃদয়ে যেন সব ভুলে বসে আছেন ; এ সব সম্মানের citationএর (সম্মান প্রদানের সময় উচ্চারিত বা প্রদত্ত লিপি) নকল নেব বলে দেখতে চেয়েছিলাম। বললেন, "কিছুই নেই, যদি বা ২।১টি থাকে, কোথায় আছে জানিনে।"

নানা দেশের বিবিধ পণ্ডিত-সম্মিলনে বহু বার আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান

১৯৫১ সনে সত্যেন্দ্রনাথ Unescoর আমন্ত্রণে প্যারিসে গিয়েছিলেন। তখন সেখান হতে ইংলণ্ড ও জার্মানীতে ভ্রমণ করেন। সব দেশেই বিবিধ বিদ্বন্মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

দুই বৎসর পর (১৯৫৩) ফ্রান্সের Council of National Scientific Research (C N R S)এর নিমন্ত্রণে তিনি ইউরোপে যান। এই সনেই আপেক্ষিকবাদের অগ্রগতির নূতনতর তত্ত্ব আবিষ্কারের বিষয় আইনষ্টাইনের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ হয়। আবিষ্কারের বিষয় হল Unitary Theory. Comptes Rendes পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয় (১৯৫৩)।

ইউরোপে যে শান্তি-সম্মিলন (World·Congress for General Disarmament and Peace) আছে, জেনেভায় তার প্রধান কার্যালয়। সে বার বুদাপেষ্টে তার সম্মেলন বসল। আমন্ত্রিত হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ তাতে যোগদান করলেন। ১৯৬২ সনে সুইডেনের অন্তর্গত এস্‌কিলষ্টুনা সহরে ১৯শে ও ২০শে মে তারিখে যে অধিবেশন হয়, তাতেও সত্যেন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হন।

বুদাপেষ্ট সম্মেলনের পর (১৯৫৩) সত্যেন্দ্রনাথ রাশিয়ায় বেড়াতে গিয়েছিলেন।

১৯৫৪ সনে সত্যেন্দ্রনাথ আবার ফ্রান্স ও জার্মানীতে গিয়েছিলেন। প্যারিসে আন্তর্জাতিক সভায় যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর প্রবন্ধের বিষয় ছিল Crystallography.

C N R Sএর আমন্ত্রণে আবার তাঁকে পরবৎসর (১৯৫৫) ফ্রান্সে যেতে হয়। সেখানে গিয়ে শুনলেন, সুইজারল্যাণ্ডের বার্ণ সহরে 50 Years of Relativity Conference শীঘ্রই বসবে। এই সেই বার্ণ সহর, যেখানে আইনষ্টাইন প্রথম জীবনে পেটেণ্ট আফিসে কেরানীর কাজ করতেন। তাঁর Theory of Relativity (আপেক্ষিকবাদ) আবিষ্কারের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তিতে এই সম্মেলন। এই বিষয়ে দেশ-বিদেশের বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এই ৫০ বৎসর ধরে বহু চর্চা করেছেন, তাঁদের এই সম্মেলন। এই সব চর্চাকারীদের মধ্যে যাঁদের নাম আইনষ্টাইনের সঙ্গে যুক্ত হবার মর্যাদা পেয়েছিল— তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ অন্যতম প্রধান ব্যক্তি।

সত্যেন্দ্রনাথের এই সম্মেলনে যোগদানের সুযোগ হল। সেখানে জ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা করলেন, বহু সম্মানে ভূষিত হলেন।

এই বছরই ১৮ই এপ্রিল, ১৯৫৫ আমেরিকায় এক হাসপাতালে অধ্যাপক বসুর গুরু আইনষ্টাইনের মৃত্যু হয়। সেই সময়ে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের "আইনষ্টাইন" প্রবন্ধটির কিয়দংশ এই পুস্তকের অন্যত্র মুদ্রিত হল।

১৯৫৬ সনে 'ব্রিটিশ এসোসিয়েসন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়ান্স' হতে সাদর আহ্বান এসেছিল। লণ্ডনে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে তিনি যোগ দিতে গিয়েছিলেন। দুই বৎসর পরই রয়াল সোসাইটি তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করে সম্মানিত করেন।

১৯৬২ সনের ৬ই আগষ্ট হতে ৮ই আগষ্ট পর্যন্ত টোকিয়ো সহরে বিজ্ঞান ও দর্শনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসেছিল। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা-সমিতির আমন্ত্রণে অধ্যাপক বসু সেখানে গিয়েছিলেন। এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক সম্মেলনীর পর বিজ্ঞান ও বিবিধ ক্ষেত্রে জাপানের নবজাগরণের নানা প্রশংসনীয় কীর্তি দেখে এসেছেন। জাপানের এই নব অভ্যুদয় দেখে সেখানে আনন্দপ্রকাশ করে, তিনি এক বক্তৃতাও করে এসেছেন।

জানতে চাইলাম, "এত দেশে গেছেন, সে সব দেশে আপনি কি বললেন, তাঁরাই বা আপনার সম্বন্ধে কি বলল?"

উনি বললেন, "বলেছিলাম সব দেশেই কিছু কিছু, লেখা ছিল না বিশেষ কিছু, কে কি বলেছিলেন সব ভুলে গেছি।"

এই স্মৃতিধরের যে কিছু ভুল হয় না, তা দেখেছি। কিন্তু এসব তিনি স্মরণীয় বলেই মনে করেন না। প্রশংসা ও যশোগৌরব হতে নিজেকে বিমুক্ত রাখার ক্ষমতা সত্যেন্দ্রনাথের অসাধারণ। শ্রদ্ধেয় গিরিজাপতি ভট্টাচার্য মহাশয়ের স্মৃতি-কথা হতে একটি বিবরণ কৃতজ্ঞতা সহকারে উদ্ধার করছি—

"১৯২৫ অব্দের গোড়ার দিক্। শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এসেছি প্যারিসে। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে একই বাড়ীতে ছিলাম। একদিন সারা রাত বরফ পড়েছে, সকালে উঠে দেখি, পেঁজা তুলোর মত সাদা বরফে চারি দিক্ রাস্তা বাড়ী ছেয়ে গেছে। কনকনে ঠাণ্ডা। সত্যেন্দ্রনাথের ঘরে এলাম। তিনি 'শোকোনা' (কোকো) আনবার আদেশ দিয়ে আইনষ্টাইনের মন্তব্য-সম্বলিত ছাপান গবেষণার এক কপি হাতে দিলেন। সেটি নিয়ে আমি যথাসাধ্য বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ব্যাপারটি মোটামুটি বুঝিয়ে দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ মূল ইটালিয়ান ভাষায় লেখা Danteর The Divina Commediaতে মনোনিবেশ করলেন। বইটি সবে সে দিন সকালে পড়তে সুরু করেছিলেন; ছাপান গবেষণার কপিগুলি সত্য সেই সময় তাঁর হাতে এসেছিল।

আমি গবেষণার বস্তু ও আইনষ্টাইনের চিন্তায় নিমগ্ন হলাম। আর সত্যেন্দ্রনাথ একটানা দান্তে পড়ে শেষ করলেন। তাঁর গবেষণা আইনষ্টাইন কর্তৃক সমর্থিত, আদৃত ও প্রকাশিত হয়ে বিজ্ঞানজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চলেছে, এ ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপমাত্র করলেন না। বই পড়া শেষ করে আমাকে নিয়ে একত্রে বরফ পড়ার মধ্যেই 'লাঞ্চ' খেতে বেরিয়ে পড়লেন।"

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার আন্দোলন ও সত্যেন্দ্রনাথ

১৮৯৪ সনে (বাংলা ১৩০০ সালে) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার বৎসর হতে ৪২ বর্ষ পর্যন্ত প্রায় প্রতি বৎসর 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় বৈজ্ঞানিক পরিভাষার আলোচনা করা হয়েছে এবং বিজ্ঞানের বহু ধারার ইংরাজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বা পরিভাষা সৃষ্টি করা হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায়, চুণিলাল বসু প্রভৃতির এই সম্বন্ধীয় কাজ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। আরো যাঁদের কাজ ঐ পত্রিকায় আছে, তাঁদের নাম পরিশিষ্টে (ঙ) দেওয়া হল।

এঁরা অনেকেই স্ব স্ব বিজ্ঞানের বিষয়ে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এঁরা ছাড়া অন্য যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁদের নাম পরিশিষ্টে (চ) দেওয়া হল।

১৯০৬ সনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখলেন, 'নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি'; তার ভূমিকায় তিনি লিখলেন,

"দেশের দুর্গতি ও দুরবস্থার বিষয় এখন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই আলোচনা করিয়া থাকেন; তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন যে, যতদিন একদিকে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং অন্য দিকে কোটি কোটি নরনারী অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিবে,

ততদিন আমাদের উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার আশা কম। যাঁহারা ইংরাজী ভাষা অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান শিখিতেছেন, তাঁহারা অগাধ জলরাশির মধ্যে শিশিরবিন্দুর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। ইংলণ্ডে বহু কাল হইতে বিজ্ঞান বিষয়ে সাধারণের বোধগম্য অনেক সরল পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে তাহার ভাব ও স্থূল মর্ম প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। এই প্রকার শ্রেণীগত পার্থক্য আমাদের দেশে অত্যধিক প্রবল।”

পরবৎসর তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল, “National Education on National lines”। তা হতে উদ্ধার করছি, “জাতিগঠনের উদ্দেশ্যে কি উপায়ে শিক্ষা প্রদান করা হবে, সেই প্রশ্ন এই দেশে এ বৎসর খুব প্রধান হয়ে উঠেছে। বর্তমান কালের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে বিজ্ঞান খুব জরুরী। এই সম্বন্ধে কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, আমাদের দেশে অধিকাংশ জনসাধারণের মধ্যে যদি আমরা বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি প্রচার করতে চাই, তবে সে প্রচার দেশীয় ভাষায়ই করতে হবে।— বিদেশী ভাষায় নয়—তা সে বিদেশী ভাষা যত সম্পন্নই হোক না কেন?”

“ঠিক এই ব্যাপারে, অন্যান্য অনেক বিষয়েও, আমাদের জাপানের কাছ হতে শিক্ষা নেওয়া দরকার। সে দেশের বৈজ্ঞানিকেরা শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে, দেশের ভূমিতেই যদি বিজ্ঞানের অগ্রগতি চাওয়া হয় এবং তাকে যদি জাতির নিজস্ব করতে হয়, তবে বিদেশী গাছের মত তাকে ঠাণ্ডাঘরে লালন

পালন না করে দেশী ভাষায়ই শিক্ষা দেওয়া দরকার—অন্তত বিজ্ঞানের মূল প্রারম্ভিক তত্ত্বগুলি। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা টোকিও ও ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে—এমন কি, কঠিন কঠিন বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলিও জাপানী ভাষাতেই বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন।" [কিয়দংশ তর্জমাকৃত, Modern Review, May, 1907]

এই সময় জগদানন্দ রায় মহাশয়ের সুন্দর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছিল। এতেই প্রমাণ হয়েছিল যে, যত্ন করলে পরিভাষার জন্য আটকায় না। তবু পরিভাষার জন্য চেষ্টা চললই। ১৯১২ সনে প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাসায়নিক পরিভাষা' পুস্তক প্রকাশিত হল। 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ফর দি কালটিভেসন অব সায়ান্স'এর প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের পুত্র ডাঃ অমৃতলাল সরকারের সম্পাদকতায় 'বিজ্ঞান' নামক পত্রিকার প্রকাশ ১৯১৩ সন হতে আরম্ভ হল।

১৯১৬ সনে 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনী'র যশোহর অধিবেশনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণে আচার্য প্রমথনাথ বসুও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার যৌক্তিকতা দেখালেন।

১৯২১ সনে নলিনাক্ষ ভট্টাচার্যের 'মনোবিজ্ঞান' ও ১৯২৩ সনে গিরিশচন্দ্র বসুর 'উদ্ভিদ-জ্ঞান' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ প্রকাশ করলেন। এই সনেই প্রকাশিত জগদীশচন্দ্রের 'অব্যক্ত' বাঙ্গালা ভাষায় তাঁর বিজ্ঞানের ধারক হল। আচার্য জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর (১৯৩৭ সন) পর দেখা গেল যে, তিনি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্য তিন হাজার টাকা রেখে গেছেন। সেই টাকা হতে পরিভাষা-সংগ্রহকারীকে বৃত্তি দেবার জন্য 'জগদীশচন্দ্র স্মৃতিতহবিল' গঠিত হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধী ১৯২৫ সনের ২৬শে মে তারিখে পরিষদে এসেছিলেন ; বললেন,—"আমাদের উচ্চতম হইতে নিম্নতম পর্যন্ত সর্বপ্রকার শিক্ষা যখন মাতৃভাষাতে দিতে পারিব, মাতৃ-ভাষাকে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন করিতে পারিব, তখনই আমাদের জাতির শক্তি বৃদ্ধি হইবে···"

'চলন্তিকা' অভিধানের প্রথম সংস্করণের (১৯৪৯ সন) শেষে বহু পারিভাষিক শব্দ যোজিত হয়েছে।

দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার যে আন্দোলন রামেন্দ্রসুন্দর, প্রফুল্লচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি আচার্যগণের স্মৃতিতে উজ্জ্বল, পরবর্তী কালে সে কাজে এগিয়ে এলেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ঢাকায় থাকতে তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা প্রকাশ করলেন, 'বিজ্ঞান-পরিচয়'।

এখন 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' সব প্রসঙ্গই আলোচিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের সহজ অথচ বিবিধ তথ্য, বিবিধ জ্ঞানের নানা অগ্রগতির বিবরণ, এমন কি, কঠিন গবেষণামূলক প্রবন্ধও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে বিজ্ঞানকে বাংলা ভাষায় শিক্ষিত সাধারণের গোচর করেছে। প্রথম বর্ষেই (১৯৪৮) সত্যেন্দ্রনাথ এই পত্রিকায় 'শক্তির সন্ধানে মানুষ' শীর্ষক যে জ্ঞানপ্রদায়ী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় লিখেছিলেন, এই পুস্তকের অন্য অধ্যায়ে তার কিয়দংশ প্রদত্ত হল।

কিন্তু দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার এই চেষ্টা ও যুক্তি এইখানেই নিঃশেষিত হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় (১৯৬২) সত্যেন্দ্রনাথ যে ভাষণ প্রদান করেন, তাতে বলেছেন—

'এখন সময় হয়েছে, আর বিলম্ব নয়, প্রদেশের ভাষা দিয়েই সকল রকমের শিক্ষা দিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীতে। ৫০ বৎসরেরও আগে এ দেশের চিন্তানায়কদের কাছে এইটি সম্ভবপর বলে মনে হয়েছিল। এখন এই বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভ্যগণ ও আইন-সভার সভ্যগণকে যত্ন করে বিবেচনা করতে হবে। এখন এদেশে ত্রিশটিরও বেশী বিশ্ববিদ্যালয়। আরো অনেক হবে। উচ্চতর শিক্ষা যখন কেন্দ্রীয় সরকারের দায়, তখন অনেকে ভাবছেন যে, সব বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষার মান একরূপ হওয়া কর্তব্য। তাঁরা সর্বজনগ্রাহ্য ও আচরিত একটা রীতি নীতি সৃষ্টির পক্ষপাতী। তাঁরা মনে করেন যে, তা হলেই তো শিক্ষা দেবার ভাষা একটি মাত্রই রাখা দরকার হচ্ছে। এইরূপ রীতিনীতি সৃষ্টিতে যাঁরা উৎসাহী, তাঁরা অনির্দিষ্ট কালের জন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই ইংরাজী ভাষায়ই শিক্ষাদান চালিয়ে যেতে চান।

আমি চিরদিনই গতানুগতিক পথে চলার মনোভাবকে অবিবেচনার কাজ বলে প্রতিবাদ করে থাকি। এই বিদেশী ভাষাই আমাদের দেশে অক্ষরপরিচয়-জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধির অন্তরায়। এতদ্দ্বারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুখস্থ করার উৎসাহ

জন্মে এবং স্বাধীন চিন্তা স্তিমিত হয়।' (তর্জমাকৃত; মূল মনোজ্ঞ ভাষণটির কিয়দংশ এই পুস্তকের অন্য অধ্যায়ে মুদ্রিত হল।)

সত্যেন্দ্রনাথ জাপানে গিয়েছিলেন ১৯৬২ সনে। সেই সনের অক্টোবর মাসে হায়দ্রাবাদে যে "আংরেজী হঠাও সম্মেলন" হয়, তাতে তিনি বাঙলা ভাষায় দুদিন বক্তৃতা করেন। তার টেপ-রেকর্ড করা হয়েছিল। তা হতে এই প্রসঙ্গের কিয়দংশের উদ্ধার করছি—

"প্রায় ১০০ বছর হল, পাশ্চাত্য জাতের হাতে ঘা খেয়ে জাপান ঠিক করলো, যে-জ্ঞান ও বিদ্যার জন্য প্রতীচ্য এত শক্তিমান্ হয়েছে, তাদের দেশের সে-জ্ঞান ও সে-বিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে। এখনও ১০০ বছর হয়নি; এরই মধ্যে জাপানের কীর্তিকলাপের কথা সকলেই জানেন। আমি গিয়ে দেখলাম যে, ১৭ বছর আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন জাপানের হার হলো, তখন জাপানের দুরবস্থার শেষ ছিল না; আজকে কিন্তু জাপানে গেলে মনে হবে না যে, এ রকম কোন অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁদের যেতে হয়েছিল।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এত অল্প সময়ের মধ্যে দেশের সেই দুরবস্থা থেকে বর্তমানে এই অতিসম্পদের মধ্যে কি করে তারা দেশবাসীদের আবার তুলে ধরল। আমি তাই জানতে চেষ্টা করেছিলাম, সেখানে শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা কি রকম ভাবে হয়েছে।...

আমাদের ভারতীয় ভাষাগুলির তুলনায় জাপানী ভাষার কতকগুলি অসুবিধা আছে, যাঁরা একটু খবর রাখেন, তাঁরাই জানেন। একটা অসুবিধা হল যে, আমাদের যেমন অল্পসংখ্যক অক্ষর দ্বারাই সব বাক্য লেখাও যায়, বইতেও ছাপান যায়, জাপানী ভাষাতে সে-ব্যবস্থা নেই। আছে নিজেদের অক্ষর এবং চৈনিক অক্ষর প্রায় হাজার তিনেক। যাঁরা উচ্চশিক্ষায় ইচ্ছুক, তাঁদের এসব-কটাকেই শিখতে হয়। এর জন্য আমাদের দেশে যেখানে মাতৃভাষা বছরখানেক বা বছর দুয়েকের মধ্যে চলনসই আয়ত্তের মধ্যে এসে যায়, ছেলে মেয়েদের সেখানে জাপানী ভাষা শিক্ষা করতে গড়ে লাগে প্রায় ছয় বৎসর।

এত অসুবিধা সত্ত্বেও এমন অবস্থা জাপানী ভাষার যে, প্রত্যেক জাপানী বিজ্ঞানী, জাপানী দার্শনিক নিজের মনের প্রত্যেকটি কথা জাপানীতে প্রকাশ করতে পারেন। এতে সুবিধা হয়েছে এই যে, দেশের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা যখন চালু হয়েছিল, তখন তার জন্য শিক্ষক পাবার কোন অসুবিধা ছিল না—এমন শিক্ষক, যিনি জাপানী ভাষাতে বিজ্ঞান কিম্বা দর্শন কিম্বা অন্যান্য কলাবিদ্যা সমস্ত আয়ত্ত করে নিয়েছেন ও পড়াতে পারেন।”

যে সম্মেলন উপলক্ষে অধ্যাপক বসু জাপানে গিয়েছিলেন, তাতে যে-ভাষার ব্যবহার হয়েছিল, তার একটি সুন্দর বর্ণনা তিনি দিয়েছেন রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সমাবর্তন ভাষণে (২২ শে মার্চ, ১৯৬৩)। নিম্নে তা হতে তুলে দিচ্ছি—

“এখানে বহু বিজ্ঞানীর সাথে দেখা হল—গণিত, পদার্থ-বিদ্যা,

প্রাণতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতিতে পণ্ডিত ব্যক্তি—অধিকাংশই জাপানী ; বিদেশীও ছিলেন—আমেরিকার দার্শনিক, যুগোশ্লাভিয়ার গণিত-বিদ্। আমি ভেবেছিলাম, এই আলোচনা-সভায় (বিজ্ঞানার্জিত ফলদ্বারা দেশগুলির কি করে মঙ্গল করা যায় এবং মানুষের ভবিষ্যৎ কী ?) কোন বিদেশী ভাষা ব্যবহৃত হবে। কিন্তু পৌঁছবার পর আমাকে বলা হল যে, যদিও প্রায় সব জাপানী বিজ্ঞানীরাই ইংরাজী বোঝেন এবং হয় তো আরও কয়েকটি বিদেশী ভাষা জানেন এবং অনেক সময় পড়েন, আমি যেন সম্মিলনের অধিকাংশ কথা জাপানী ভাষাতে শুন্‌তে তৈরী থাকি। তবে, আমাকে একজন দোভাষী দেওয়া হবে ; তিনি বক্তাদের আসল কথাগুলি আমাকে বলে দেবেন এবং আমার যখন বলার সময় আসবে, ঐ দোভাষী জাপানী ভাষায় তা সম্মেলনের অন্য সভ্যদের বুঝিয়ে দেবেন। দেখা গেল,এতে বেশ কাজ চলেছিল এবং আমি দেখে বিস্মিত হলাম যে, বিজ্ঞানার্জিত ফলদ্বারা দেশের কি করে মঙ্গল করা যায়, তার জটিল ও সূক্ষ্ম আলোচনা অতি সহজে জাপানী ভাষাতেই করা গেল। এবং আমরা বিদেশীরা যখন কথা বললাম, তখন তাঁরা স্বচ্ছন্দে বুঝলেন এবং আমাদের বক্তব্যের সুন্দর প্রতিবাদ বা সমর্থন করলেন। জাপানে আমি ভারতীয় ছাত্রও দেখলাম।

আমি জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও গিয়েছিলাম। কতকগুলিতে পদার্থ-বিদ্যার একবারে আধুনিক তত্ত্ব জাপানী ভাষাতে শেখাতে দেখলাম; তারি সাথে দেখলাম, কি উৎসাহ নিয়ে জাপানী

ছেলেরা অতি কঠিন অনেক মৌলিক গবেষণায় লিপ্ত হয়েছে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ছাত্রেরা পরস্পরের মধ্যে মাতৃভাষাতেই বিজ্ঞানের আলোচনা করে থাকেন। তাঁরা অনেক বিদেশী শব্দ তাঁদের কথার মধ্যে ধার করে ব্যবহার করেন। এ ব্যবহার তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই করেন, লজ্জা পান না।…"

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ফলে জাপানে শতকরা ৯০ জন শিক্ষিত এবং বিজ্ঞানের দ্রুততর উন্নতি হয়ে জনসাধারণের মধ্যে তার ব্যবহার ও মর্যাদা ছড়িয়ে পড়েছে—এই কথা, বিস্তৃত করে অধ্যাপক বসু তাঁর হায়দ্রাবাদের বাঙলা ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতায় বলেছিলেন। সেই বক্তৃতায় উল্লেখযোগ্য নানা মূল্যবান্ কথার মধ্যে নিম্নলিখিত কথা কয়টি এখানে উদ্ধার করে তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষাকে আরও স্পষ্ট করতে চাই।

"এটা ঠিক যে, দেশ বলতে যদি দেশের লোককে বুঝায়, শুধু শিক্ষিত বা নায়কসম্প্রদায় না হয়, যদি মনে হয়, দেশের সাধারণ লোকই দেশ, তবে এরা শিক্ষিত হলেই তো সে-দেশকে উন্নত বলা যাবে। এবং দেশকে সকল বিপদ্ হতে রক্ষা করার জন্য সমূহ শক্তিই তাদের হাতের মধ্যে থাকবে।" (তর্জমাকৃত)

সর্বক্ষেত্রে মাতৃভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সত্যেন্দ্রনাথের এই আন্দোলন, এ দেশে নানা ক্ষেত্রে আলোচনার সৃষ্টি করেছে। সমর্থন ও প্রতিবাদের জন্যই এই আলোচনা। আশা হয়, পূর্বাচার্যদের আকাঙ্ক্ষিত এই আঞ্চলিক ভাষাতে বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার আন্দোলনের জয়, অন্তত বাঙলাদেশে, সত্যেন্দ্রনাথের হাত দিয়েই অর্জিত হবে।

সত্যেন্দ্রনাথের রচনা ও বক্তৃতা

এ দেশে বর্তমান যুগে যশস্বী ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা সব চাইতে কম লিখেছেন, সম্ভবত সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। দেশে বিদেশে তিনি বিজ্ঞান, শান্তি ও মানবপ্রীতি সম্বন্ধে যে সব বক্তৃতা দিয়েছেন, তার অধিকাংশই লিখে দেন নি। তাই তাঁর নিজের কাছে সে সবের কোন চুম্বক নেই। যদি কোন কাগজ-পত্রিকা-রিপোর্টে তা প্রকাশিত হয়ে থাকে, তবে তা খুঁজে তিনি স্বচক্ষে কোন দিন দেখেন নি। কারণ, কি হবে তা দিয়ে?

তাঁর লিখিত প্রবন্ধের সন্ধান ও পরিচয় যা পাওয়া যায়, তার তালিকা পরিশিষ্টে মুদ্রিত হল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ 'শতদল' (ঢাকা হল) ও 'বাসন্তিকা' (জগন্নাথ হল) নামে বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। বাসন্তিকায় (১৩৩৬) একজন সত্যেন্দ্রনাথ বসুর লেখা, 'সেকালের ঢাকা' প্রকাশিত হয়েছে। এটি প্রাক্তন ছাত্রসম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ। এটি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর লেখা নয়। উনি বললেন, 'শতদল' ও 'বাসন্তিকা'য় তিনি কিছু লেখেন নি। উনি ঐ সত্যেন্দ্রনাথ বসু নহেন।

১৯৩৪ খৃঃ অব্দে আজিজুল হক সাহেব লিগ-শাসনের আমলে অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন। সেই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষাসপ্তাহ উৎসব হয়েছিল, তার একদিনের

বক্তৃতা দিয়েছিলেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ। এই বক্তৃতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা Calcutta Reviewতে নেই। উনি বললেন, "সুধীর ঘোষ, যিনি পরে M. P. হয়েছিলেন, তাঁর কাগজে ছাপবেন বলে বক্তৃতার কাগজটি নিয়েছিলেন। কি কাগজ, মনে নেই। ছেপেছিলেন কি না, তাও জানিনে।"

সম্ভবত এই বক্তৃতা ও অন্য একটি সম্বন্ধেই সত্যেন্দ্র-বান্ধব ধূর্জটিপ্রসাদ লিখেছেন—"দুবার Mathematical Physics সম্বন্ধে বক্তৃতা দেয়, কিছুই বুঝলাম না। একটা কেবল আশ্চর্য লাগল—প্রায় দুই ঘণ্টা বলে গেল ইংরাজীতে, একবার আমি কথাটা ব্যবহার করল না। It can be agreed, it can be often said ; one can state ইত্যাদি। খুব ভিড় হয়েছিল প্রত্যেক বার ; কিন্তু সেখানে আমিই একমাত্র নালায়েক।"

সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় লেখা বা বক্তৃতা সম্বন্ধে অবৈজ্ঞানিক ধূর্জটিপ্রসাদের না-লায়েক বা না-বোঝার দুঃখ অনেককে ভাগ করে নিতে হবে তখন, যখন পড়া হবে—

"মনে রাখিতে হইবে মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বানুমোদিত গতিশাস্ত্রের ভিত্তি ব্যক্তি-নিরপেক্ষ দেশকালের পরিকল্পনার উপর নির্ভর করিতেছে। এই পরিকল্পনার পরিবর্তে আপেক্ষিকবাদের প্রচার করিতে গিয়া আইনষ্টাইন দেখিলেন, নিউটনীয় শক্তি পরিকল্পনার স্থান তাঁহার প্রবর্তিত নূতন বিজ্ঞানে নাই। কাজেই জড়ের, গ্রহের, তারকারাজির গতি-বৈচিত্র্যের ভিন্ন

হেতুনির্দেশের প্রয়োজন হইল।…(পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৪২ সালে প্রকাশিত 'আইনষ্টাইন' প্রবন্ধ হতে)

"…প্রত্যেক পরমাণুটি যেন একটি সূক্ষ্ম সৌরমণ্ডল। মধ্যে প্রায় সমস্ত ভর জড় করে রয়েছে +বিদ্যুৎ। কেন্দ্রের চার দিকে একটি খুব ছোট গোলকের মধ্যেই প্রায় সমস্ত ভরবস্ত আটকান। ভাবা যায় যে, সে গোলকের ব্যাসার্ধ হবে ১০-১২ সে মি পর্যায়ের। কেন্দ্রের + বিদ্যুতের আকর্ষণবলে দূরে দূরে নিজের কক্ষের মধ্যে ঘুরছে নির্দিষ্ট সংখ্যক ইলেক্ট্রন। তাদের কক্ষচ্যুত করতে, কেন্দ্রের শাসনের বাইরে আনতে, কাজ করতে হয়—বিভিন্ন মাপের কার্যমান বিভিন্ন বলয়ে ইলেক্ট্রনের অবস্থান জানাচ্ছে।…"(জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৪৮, 'শক্তির সন্ধানে মানুষ' হতে)

যাঁদের বিজ্ঞানের সঙ্গে যোগ নেই বা সামান্য যোগ আছে, তাঁদের পক্ষে উপরোক্ত লেখার তাৎপর্য আয়ত্ত করা সহজ নয়, স্বীকার করি। কিন্তু বিজ্ঞানের আধুনিক স্নাতক শ্রেণীর যে-ছাত্রের পাঠ্য হল রসায়ন, গণিত ও পদার্থবিদ্যা, তাঁদের পক্ষে উপরোক্ত উদ্ধৃত অংশ উত্তরোত্তর বোধগম্য বিবেচিত হবে। উদাহরণের জন্যই সত্যেন্দ্রনাথের দুটি বাংলা বিজ্ঞান-প্রবন্ধ হতে তার একটু কঠিনতম অংশই উদ্ধার করে দেখান হল। এই অংশ উদ্ধার করে সম্মুখে ধরার আর একটি উদ্দেশ্যও আছে। আপেক্ষিকবাদ ও শক্তিকণাবাদ—যে দুটি জ্ঞানের ব্যবহার হল বিজ্ঞানের আধুনিকতম ও কঠিনতম ধ্যানার্জিত ফল, তার বর্ণনা ও বিশ্লেষণের সূত্রপাত উপরোক্ত উদ্ধৃত অল্প

কথায়ই অনেক সহজে বাংলাভাষায় সত্যেন্দ্রনাথ করতে পেরেছেন।

যে-ভাষায় ভারতের বিবিধ ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়, তা যেমন সর্বজনবোধ্য ভাষায় লেখা হয় না, তেমনি উন্নততর বিজ্ঞানের বাংলা ভাষাও সর্বজন বোধ্য হবার কথা নয়। তবু সত্যেন্দ্রনাথের এই বাংলা যেন অতখানি দুর্বোধ্য পর্যায়ের নয়।

উপরোক্ত দুটি প্রবন্ধ ও জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথের 'আইনষ্টাইন' প্রবন্ধ হতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃতি পাওয়া যাবে। কত সহজ ভাষায় নির্বিঘ্নে তিনি আমাদের বিজ্ঞানের অঙ্গনপ্রাঙ্গণ ভোজসভায় বসিয়ে দিতে পারেন, তা দেখা যাবে।

আইনস্টাইনের মৃত্যুর পর সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর এই গুরুর জীবনের যে আলোচনা করেছেন, তাতে আইনষ্টাইনের পরিণত বয়সের একটি উক্তি তিনি বর্ণনা করেছেন,

"—বুদ্ধির দ্বারা জগৎকে যতটুকু পাওয়া সম্ভব,তার প্রয়াসই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য বলে মনে হোলো। অতীতে বহু লোকই এ কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন—বর্তমানেও এই কাজে নিজেকে নিয়োগ করেছেন বহু লোক। তাঁদের অর্জিত জ্ঞান আমার এই সাধনার নিত্যসহায় হবে। এই সাধনার পথ হয় তো ধর্মমার্গের মত চিত্তাকর্ষক কিম্বা সুখপ্রদ নয়, তবু কখনও বিশ্বাস হারাইনি ; এই পথের পথিক হয়েছি বলে একবারও অনুশোচনা করতে হয়নি।"

আইনষ্টাইন-শিষ্য সত্যেন্দ্রনাথের মনেও এই প্রশান্তি তাঁর দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায়। এ তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার জন্য জগৎ-বিধাতার পুরস্কার।

সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"...কত অতিকায় জন্তু লোপ পেয়েছে। ক্ষীণকায় মানুষ হাজার হাজার বৎসর টিকে আছে। বহু শত পুরুষানুক্রমের অভিজ্ঞতার ফলে সে প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের কাজে লাগাতে শিখেছে।...(তার সঙ্গে) নিবিড় পরিচয়ের ফলে ঘটনাপরম্পরার মধ্যে অমোঘ শৃঙ্খলা তার কাছে আজ স্পষ্ট।... গাছ থেকে ফল পড়ে, সৌরমণ্ডলে গ্রহেরা নিজের পথে চলে ফেরে, মহাকর্ষের একই নিয়মের সূত্রে, এইরূপ বহু বিচিত্র ঘটনাকে একসঙ্গে যুক্ত করে ফেলেছে সে। অণুর প্রতি অণুর আকর্ষণের রহস্য আজ তার কাছে গোপন নেই।...বহু বাধা সে অতিক্রম করেছে, অদম্য ইচ্ছার চাপে প্রতিকূল অবস্থাকে করে তুলেছে তার অনুকূল। গভীর অরণ্যের জায়গায় আজ বসেছে লোকপূর্ণ জনপদনগরী; উচ্ছৃঙ্খল বন্যার জলরাশি তার বাঁধে ধরা পড়েছে, তারই বিপুল শক্তি মানুষের কল্যাণ-রথের চাকা ঘুরোচ্ছে। প্রচণ্ড উত্তাপের তেজে পাথর গলে বেরিয়ে আসছে ধাতুর স্রোত। কারখানায় তৈরী হচ্ছে কত নতুন যৌগিক পদার্থ—কাচ, সেলুলয়েড, রবার ইত্যাদি কত দৈনিক ব্যবহারের জিনিষের মালমসলা—উৎকট রোগের প্রতিষেধক কত নতুন ঔষধ—শিল্পীর তুলির জন্য কত উজ্জ্বল রং। সে আর হিংস্র জন্তুকে ভয় করে না। শাসন-মারণের

অসংখ্য অস্ত্র তার হাতে। বশীকরণেও সিদ্ধহস্ত ; বন্য জন্তু আজ তার রথ চালাচ্ছে, বোঝা বইছে বা কৃষ্টির কাজে সাহায্য করছে। বরফ-ঢাকা পাহাড়ের মাথায় সে উঠিয়েছে বিজ্ঞানের মন্দির কিম্বা স্বাস্থ্যারাম। সমুদ্রের গ্রাস থেকে কেড়ে নিয়েছে উর্বরা জমি।"

সত্যেন্দ্রবর্ণিত বিজ্ঞানের এই অঙ্গন ও প্রাঙ্গণের উপরে যে-কোন বুদ্ধিজীবী মানুষের দৃষ্টি ও কৌতূহল নিশ্চিত নিবদ্ধ হবে। কিন্তু তিন জগৎ-বিধাতা-সৃষ্ট এই সূর্যমণ্ডলের বিবিধ মহাশক্তির কথা ক্ষণতরে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—

"...নিজের ইচ্ছামত নূতন জগতের সৃষ্টি করতে বিপুল শক্তির দরকার, তাই প্রকৃতির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মূল সূত্রগুলি আয়ত্ত করতে মানুষ যত্নশীল। বস্তুর মধ্যে যে অসীম শক্তি লুকান রয়েছে, সে তাকে দখল করবে, ইচ্ছামত ব্যয় করবে ও নিজের সেবায় লাগাবে, এই তার বাসনা। সূর্যের অসীম তেজ, সমুদ্র হতে জল বাষ্পাকারে তুলে সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় ঢালছে। নদ-নদীর মধ্য দিয়ে সেই বিপুল জলরাশি আবার মহাকর্ষের বশে পাতালের দিকে ছুটছে, তার গতি দুর্বার— কার্যশক্তিও অপ্রমেয়, মানুষ তাকে নিজের কল্যাণকর কাজে লাগাতে বদ্ধচেষ্ট।...

আবার অতীতের হাজার হাজার বছরের সূর্যতেজ প্রাণ-শক্তি আহরণ করে মাটির কয়লার মধ্যে জমা রেখেছে। কার্বনের পরমাণু অক্সিজেনের পরমাণুর সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে অতীতের আকাশে যে বিরাট্ পরিমাণ কার্বন-ডাইঅক্সাইড

চার দিকে পরিব্যাপ্ত ছিল,প্রাণসূর্যরশ্মির সাহায্যে তাকে বিযুক্ত করে, আবার সেই কার্বন দিয়ে গড়েছিল কোটি উদ্ভিদের কায়-বস্তু। অতীত যুগের বিরাট অরণ্য মাটির মধ্যে কবে লোপ পেয়েছে। আজ তার সারবস্তু ভেঙ্গে চুরে কয়লা হয়ে গিয়েছে। কয়লাকে আবার অক্‌সিজেনের সঙ্গে মিলিত হতে দিলে দাহের ফলে প্রকাশিত হবে সেই অতীত যুগের সঞ্চিত তেজ।···মাটির মধ্যে যে তেলের স্রোত বইছে, তাও এক হিসাবে অতীতের সঞ্চিত দান।"

"··প্রাকৃতিক সম্পদ্ সারা পৃথিবীতে একই ভাবে ছড়ান নেই। জাতির মধ্যে যাঁরা প্রভাবশালী, তাঁরা সমস্ত খনিজ সম্পদ্ নিজেদের দখলে রাখতে উদ্‌গ্রীব। ফলে হয় কঠোর সংগ্রাম। এতে সারা বিশ্বের সঞ্চিত ধন পরিণত হয় ভস্ম ও ধ্বংসস্তূপে।"

মানুষ আত্মপ্রয়োজনে শক্তির সন্ধানে গিয়ে কি ভাবে হিংসাদ্বেষের অনুবর্তী হয়, তৎফলে প্রয়োজনীয় সঞ্চিত বস্তু নষ্ট করে, ইতিহাসের সূত্র ধরে সত্যেন্দ্রনাথ তা দেখিয়ে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত যুদ্ধ বিগ্রহের পরিণামের প্রতি সভ্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

"বিজ্ঞানের জয়যাত্রার বিস্ময়কর পরিণতি দাঁড়িয়েছে আজ। কোন বাধাই তার কাছে অনতিক্রমণীয় মনে হয় না। বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ভূলোকেরও ঊর্ধ্বে সে মানুষকে নিয়ে গেছে। যে দূরত্ব অতিক্রম করতে আলোকেরই লাগে লক্ষ বছরেরও বেশী, তারও বাইরে অবস্থিত নীহারিকা, নক্ষত্র-মণ্ডলের

খবরও তার যন্ত্রে ধরা পড়েছে। সৃষ্টিছাড়া তেজস্ক্রিয় পদার্থকে বাস্তব জগতে অবতরণ করিয়েছে—আবার কি ভাবে—কিসের তাড়নায় বিশ্বব্যাপী কোন্ আদি উপাদানের বিপর্যয়ে বিচিত্র অণু-জগৎ বা রহস্যময় নক্ষত্রালোকের সৃষ্টি হলো, তাও সে ভাবতে সুরু করেছে।···এই বিরাট জ্ঞানও যে সব সময়ই মানুষের কল্যাণে রত রয়েছে, তা নয়। এই অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই মহাযুদ্ধের দাবানল বার বার জ্বলে উঠেছিল। বিজ্ঞান-সেবায় সহযোগিতা করতেন যে সব জাতি, তাঁরাই আবার স্বজাতির কল্যাণের দোহাই দিয়ে যুদ্ধের তাণ্ডবে মেতে গেলেন ও ধ্বংসলীলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে লাগলেন। মানব-হত্যায় নৃশংসভাবে নিয়োজিত হল বিজ্ঞানলব্ধ তাঁদের সর্বশক্তি। আজ মহাযুদ্ধের অবসান হলেও অস্বস্তিকর শান্তির মধ্যে বিভীষিকার অন্ত নেই। ...প্রশ্ন আজ ··মানুষের মনে জেগেছে ও দিকে দিকে ধ্বনিত হচ্ছে। বিজ্ঞানচর্চা শেষ অবধি মানুষকে কোথায় নিয়ে যাবে?"

সত্যেন্দ্রনাথের ইংরাজী লেখা হতে একটু উদ্ধার করছি। তাও কত সহজ, প্রাঞ্জল, বিষয়বস্তু কত দ্রুত পরিবেশিত হয়।

"More than a hundred years ago Raja Ram Mohan had written to Lord Amherst asking for the introduction of the study of the Western Sciences in India. The University, a few years after, came into existence in due course. But for the first fifty years in the curricula of the Universty

the principal stress was laid on the teaching of English. English was adopted as the medium of instruction of all Arts and Sciences in Colleges and in High Schools. That was also regarded as the best way of advancing thc cause of learning in this country. Our foreign masters had wanted intelligent Indians to help them run their administration and their offices economically; and so for many guardians living in the cities, it seemed that the broad way to soft jobs, and easy comfortable lives of their wards, ran through the portals of the University. This was clearly not a quick way to disseminate knowledge as the statistics of progress of literacy in a hundred years would reveal. Many years before, the catholic missionaries of Serampore had thought of a better alternative. They were the first to erect a Bengali Printing Press and published mainly religious tracts. But they also helped spread literacy among the people.

They also published text-books of Science and Mathematics in Bengali for the beginners. Bengali books on Medical Science were current

in the schools and were regularly used by the students before the advent of the University educations.

The task of spreading knowledge was soon taken up by the Indian Educationists. Iswar Chandra gave us the text-books and the keys to the traditional lore of Sanscritic learning, Akshay Chandra revealed the wonders of creation and there was soon no dearth of Bengali books in all conceivable subjects.

In creative literature, after vain efforts to write in a foreign tongue, Madhusudan and Bankimchandra realised that to gain approval of the people and an easy access to their hearts one has to write in one's own heart's blood—in that native language which springs from the age-old yearning of the sub-conscious soul and nourishes the conscious efforts of our people. If things had moved on this rising tide of national effort, if this University had then proclaimed the priciple of dispensing learning through the medium of the mother-tongue, perhaps

our dreams about the advent of a new era in this ancient land would have come true much earlier." [কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষণ (১৯৬২) হতে]

বাংলা তাৎপর্য—

"সে আজ এক শ বছরেরও আগের কথা, রাজা রামমোহন এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষারপ্রবর্তন করতে লর্ড আমহার্ষ্টকে লিখেছিলেন। কয়েক বৎসর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রথম ৫০ বৎসর পাঠ্যতালিকায় ইংরাজী শিক্ষার উপরই প্রধানত জোর দেওয়া হল। কলেজ ও ইংরাজী স্কুলগুলিতে কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার বাহনরূপে ইংরাজীই চলল। দেশে জ্ঞান বিস্তারের তাই-ই শ্রেষ্ঠ উপায় বলে বিবেচিত হল। আমাদের বিদেশী প্রভুরা রাজ্যচালনায় এদেশের বুদ্ধিমান্‌দের সাহায্য চেয়েছিলেন। তাঁদের আফিসগুলি যাতে অল্পব্যয়ে চালান যায়, তাও তাঁদের কাম্য ছিল। এ অবস্থায় শহরবাসী অভিভাবকরা দেখলেন যে, তাঁদের সন্তান সন্ততিদের সহজে চাকরী পেয়ে আরামে জীবন যাপন করার প্রশস্ত পথ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর দরজা দিয়ে। জ্ঞান বিস্তারের এ যে দ্রুতগমনের পথ নয়, গত ১০০ বৎসরে এ দেশের অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার হারের বৃদ্ধির রকম দেখেইতাস্পষ্ট বোঝা যাবে। এর অনেক বৎসর পূর্বে শ্রীরামপুরের মিশনারী সাহেবরা এর চাইতে ভাল ব্যবস্থা কল্পনা করেছিলেন। এঁরাই প্রথমে বাংলা ছাপাখানার পত্তন করে প্রধাণত ধর্ম পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। তাঁরা অধিবাসীদের শিক্ষারও প্রচলন করলেন।

প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য বাংলায় বিজ্ঞান ও অংকের পাঠ্য-পুস্তক তাঁরা প্রকাশ করলেন। বাংলায় লেখা ডাক্তারী বই ছাত্রেরা ব্যবহার করতেন ততদিন, যতদিন না বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছিল।

শীঘ্রই এ দেশের শিক্ষাবিদেরা জ্ঞান প্রচারের কাজে ব্রতী হলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত বিদ্যার পাঠ্য পুস্তক, ব্যাখ্যা ইত্যাদি দিলেন, অক্ষয়চন্দ্র সৃষ্টির লীলার বিচিত্রতা প্রকাশ করলেন এবং শীঘ্রই দেখা গেল, যতরকম বিষয় হতে পারে, কোন বিষয়েরই বাংলা ভাষায় বইএর কিছুমাত্র অভাব নেই।

সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে, বিদেশী ভাষায় কিছু দিন ব্যর্থ চেষ্টা করার পর, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করলেন যে, জনসাধারণের সমর্থন পেতে হলে এবং হৃদয়ে পৌঁছতে হলে হৃদয়ঃনিসৃত রক্ত দিয়েই তা লিখতে হবে—সেই মাতৃভাষা—যুগ যুগ ধরে অন্তরের অন্তস্তলে যার উৎস—যা মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা কর্মের পরিপোষক। জাতির এই চেষ্টা যদি এই ক্রমবর্ধমান ভাববন্যায় প্রবাহিত হত, মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রচারের নীতি যদি তখন বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করতেন, তবে এই প্রাচীন দেশে নব যুগের অভ্যুদয়ের আমাদের স্বপ্ন অনেক আগেই সফল হত।"

মাতৃভাষার প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের গভীর মমতা। মাতৃ-ভাষার ক্ষমতার উপরও তাঁর পরম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা যে যুক্তিহীন অবিচারিত ভক্তি নয়, তা তাঁর মাতৃভাষায় লেখা বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধগুলির প্রাঞ্জলতা হতেই উপলব্ধ হবে।

অধ্যাপক বসুর বর্তমানের পরিচ্ছদ, আহার ও দৈনন্দিন জীবন

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের তিরোধান (১৬ই জুন, ১৯৪৪)এর অল্পদিন পরে (অক্টোবর, ১৯৪৫) সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞানের খয়রা-অধ্যাপক হয়ে ঢাকা হতে চলে আসেন। কলকাতার বিজ্ঞানের ছাত্রসমাজের তখন এই যশস্বী অধ্যাপকের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, আচরণ, পরিচ্ছদ ও জীবন-যাত্রার পদ্ধতি জানার জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য দেখা দেয়। কারণ, আচার্যদেবের প্রভাবিত অন্যান্য অনেক ছাত্র-অধ্যাপকদের তাঁরা দেখেছেন—সকলেই আচার্যদেবের কিছু না কিছু বিশিষ্টতা পেয়েছেন। কিন্তু নীচে ট্রাউজার্স ও উপরে পশ্চিম দেশীয় কোন জামা না পরে কেউ বড় কলেজে আসতেন না। অল্প দিনেই দেখা গেল, প্রায়ই সত্যেন্দ্রনাথ ধুতি পাঞ্জাবী পরছেন। গরমের সময় পাঞ্জাবী খুলে রেখে গেঞ্জি গায়ে পড়তেন, পড়াতেন, ল্যাবরেটরীর কাজ করতেন।

একবার আচার্যদেবের বাৎসরিক স্মৃতি-সভায়, তাঁর এক ছাত্র তাঁকে গাড়ী করে নিয়ে আসেন। গাড়ীতে গেঞ্জি গায়ে বসে রইলেন, নামবার আগে পাঞ্জাবীটা গায়ে দিলেন, বোতাম একটাও লাগালেন না; সভায় স্থির হয়ে বসে রইলেন, বহু অনুরোধেও বক্তৃতা দিলেন না।

*　　*　　*

কলকাতায় আসার পর দেখা গেল, তিনি রসায়নশাস্ত্র ও শিল্প-ক্ষেত্রে তার ব্যবহারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর পরিচিত হতে চান। তাই এই সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি তিনি অনেক পড়ে ফেললেন। ফলও ফলল। পদার্থ-বিজ্ঞানের (চাপ, আলো, বিদ্যুৎ প্রভৃতির) সহায়তায় কোন কোন রাসায়নিক-সংযোগ ঘটাবার বা সংযোগের সময় হ্রাস করার ফলপ্রদায়ী অনুসন্ধানের নবতর ক্ষেত্র পাওয়া গেল।

এই সময়কার যে অন্তঃদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা আজও তাঁর চিত্তে উজ্জ্বল হয়ে আছে, তার সহায়তা নেবার জন্য এতদিন পরেও তাঁর কাছে নবীন শিল্পীরা আসছেন ; তিনি সানন্দে উপদেশ দিচ্ছেন।

* * *

যে উচ্চতর গণিত-জ্ঞানের অভিনব ব্যবহার ১৯২৪ সনে তাঁকে আইনষ্টাইনের সার্থক-শিষ্য করেছিল, তারি আরও উন্নততর প্রয়োগ দ্বারা তিনি গুরুর তত্ত্বকে আরও অগ্রগতিতে নিয়ে যান ১৯৫৩ সনে। অঙ্কের সেই ব্যবহার আজও চলছে। আজও ৬১ বৎসর বয়সে মাঝে মাঝেই তাঁকে সেই উচ্চতর অঙ্ক করতে দেখি, আর পড়তে দেখি বই। ডাইনে বামে যে বইগুলি ১০ দিন আগে পুস্তকাধারে দেখেছিলাম তার অনেকগুলি পড়া শেষ হয়ে অন্যত্র সরানহয়েছে, সেখানে এসেছে অন্য নূতন বই—বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সংস্কৃতি—দেশী ও বিদেশী তার ভাষা।

* * *

এক ভদ্রলোক এসে বললেন, "খোকাকে আনিয়ে দিন। এই সেসনেই তাঁকে J. C, Ghose Technical Instituteএ ভর্তি করে দিতে চাই। আমি ডাকলে আসবে না। এখন কোথায় আছে ঠিকানা এনেছি।"

সত্যেন্দ্রনাথ তখনি একখানা পোস্টকার্ড ভর্তি করে চিঠি লিখলেন। খোকার পিতাকে বললেন, "তোমরা মা-বাপ দুই-ই পাগল। অমন দমাদ্দম করে ছেলেকে মারে? তোমরা দুদিনও তাকে সময় দাও না।"

* * *

'সরকার চুল্লির'আপিস হতে টেলিফোন এল, তাঁরা পরদিন সত্যেন্দ্রনাথের বাড়ীর চুল্লি দেখতে আসবেন। উনি বললেন, 'বেশ ভাল কাজ হয় এই চুল্লিতে। আমার দুটি চুল্লি পাশা-পাশি। একটির তাপ অপরটির চাইতে বেশী। তাতে অল্প সময়ে ডাল সুসিদ্ধ হয়। পেঁপে দিলে হয় আরো তাড়াতাড়ি। আমি নিজে মাঝে মাঝে সখ করে রান্নার পরীক্ষা করি।'

* * *

স্নেহময়ী পুত্রবধূ এক প্লেট সদ্য-ভাজা বিস্কুটের মত নিমকী আমাদের মাঝখানে রাখলেন। সত্যেন্দ্রনাথ আমাকেও আহারে যোগ দিতে আমন্ত্রণ করলেন ; বললেন, "দার্জিলিং-এর এক বন্ধু অনেক পনীর (cheese) পাঠিয়েছেন। নিমকীতে তা কেমন হয়

দেখা হচ্ছে। কেমন হয়েছে বল।" বলেই মা মা বলে ডাকতে থাকলেন। পুত্রবধূকে বললেন,"মা, বেশ হয়েছে, তবু আর একটু মুড়মুড়ে করতে পার? আরো পনীর যোগ করে দেখতে পার।"

*　　　*　　　*

প্রতিবেসিনী এক বার বছরের বালিকা হাসিমুখে এসে দাঁড়াল—কোলে তার তিন বছরের সুপুষ্ট ভাই। সত্যেন্দ্রনাথ কাছে ডেকে আদর করলেন। মেয়েটি বলল, "কাল আমার ভাইয়ের হাতেখড়ি। আপনার আশীর্বাদের জন্য মা পাঠিয়ে দিলেন।" সত্যেন্দ্রনাথ ছেলেটিকে আরও কাছে এনে আদর করলেন। কোন বাক্য উচ্চারণ করলেন না। মুখে তাঁর অপ্রস্তুতের হাসি।

*　　　*　　　*

শান্তিনিকেতনের এক বিজ্ঞানের অধ্যাপক এলেন। নানা কথার পর, অধ্যাপক রমনের আবিষ্কারের প্রসঙ্গ উঠল। তাঁর আগে ও পরে ঐ বিষয়ে দেশে বিদেশে যে কাজ হয়েছে,অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ মিনিট দশেকে তার এক তথ্যবহুল সহজবোধ্য বর্ণনা আমাদের দিলেন। যদি কেউ শ্রুতলিপিতে তা ধরতে পারতেন, তবে একটা দলিল থাকত যে, বাংলা ভাষায় উচ্চতর বিজ্ঞান পরিবেশন করা যায়।

*　　　*　　　*

মস্ত একটি মসৃণ-গাত্র পুষ্ট কুকুর এবং ততোধিক পুষ্ট মসৃণগাত্র একটি বিড়াল এ বাড়ীর অধিবাসী। এরা এই ধ্যানী জ্ঞানী মানুষটির আদরের জন্য লালায়িত। পায়ের কাছে বসে থাকে, কোলে মাথা গোঁজে। বিড়ালটি তো নিশ্চিন্তে টেবিলের উপর চোখ বুজে বসে থাকে। যখন উনি টেবিলে বসে মাথা নীচু করে লেখেন, তখন বিড়ালটি বাঁ দিকে শুয়ে তার মাথা এগিয়ে আনে—প্রভুর হাতের আদরের চাপ পরম আহ্লাদে গ্রহণ করে,মোটা লেজটা একাগ্রচিত্ত লিখন-রত অধ্যাপকের বাম বাহু ছুঁয়ে ছুঁয়ে সান্নিধ্য ঘোষণা করে।

* * *

একদিন দেখি, খালিগায়ে লুঙ্গি পরে বসে আছেন, কিন্তু নীচে একটা ছোট ইজের। পরে বুঝেছি, মোটা মানুষ বলে এইটি তিনি অভ্যাস করেছেন—কোমরে ধুতি গুঁজে রেখে তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। এ জন্যই সম্ভবত কখনও কখনও বাইরে যাওয়ার সময় লম্বা পাজামা চুড়িদার পায়জামা প্রভৃতি পরতে দেখি।

এ সব ধুতির মত খুলে যাবে না—নিশ্চিত থাকা যায়। উপরে পাঞ্জাবী জাতীয় একটা জামা হলেই হল—কখনও খাটো ঝুল, কখনও লম্বা।

* * *

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি (১৯৪৪), ভারতের ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়ান্সের চেয়ারম্যান (১৯৪৮-৫০), বুদাপেস্টের শান্তিসম্মিলনের সভ্য (১৯৫৩), ভারতসরকারের 'পদ্মবিভূষণ' (১৯৫৪), বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৫৬), কলকাতা, যাদবপুর ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি (১৯৫৭), এফ. আর. এস (১৯৫৮), বিশ্ব-ভারতীর 'দেশিকোত্তম' (১৯৬১) এবং ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের ডক্‌টরেটের (১৯৬২) পৃথক্ পৃথক্ রূপ পরিচ্ছদ।

এই সবরকম পোশাকেই তিনি অভ্যস্ত। অনেক প্রতিষ্ঠান পদ বা উপাধির সঙ্গে এই সব পোশাক তাঁকে উপহার দিয়েছেন। সবই শিল্ক বা ঐ জাতীয়—বর্ণ তার উজ্জ্বল—কোনটিতে বা বিচিত্র কারুকার্য। শীত গ্রীষ্ম বিচার করে যখন যা প্রয়োজন, টুপি, জামা বা চাদর তিনি বাইরে যেতে ব্যবহার করেন—ফেলে রেখে লাভ কী ?

১৯৬২ সনে আগস্ট মাসে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে যখন জাপানে গিয়েছিলেন, তখন লুঙ্গি পরেই সর্বত্র গমনাগমন করতেন। প্রায় ২০ দিন সেখানে ছিলেন। বললেন, 'যা গরম !'

*　　*　　*

মস্ত একটি মসৃণ-গাত্র পুষ্ট কুকুর এবং ততোধিক পুষ্ট মসৃণগাত্র একটি বিড়াল এ বাড়ীর অধিবাসী। এরা এই ধ্যানী জ্ঞানী মানুষটির আদরের জন্য লালায়িত। পায়ের কাছে বসে থাকে, কোলে মাথা গোঁজে। বিড়ালটি তো নিশ্চিন্তে টেবিলের উপর চোখ বুজে বসে থাকে। যখন উনি টেবিলে বসে মাথা নীচু করে লেখেন, তখন বিড়ালটি বাঁ দিকে শুয়ে তার মাথা এগিয়ে আনে—প্রভুর হাতের আদরের চাপ পরম আহ্লাদে গ্রহণ করে, মোটা লেজটা একাগ্রচিত্ত লিখন-রত অধ্যাপকের বাম বাহু ছুঁয়ে ছুঁয়ে সান্নিধ্য ঘোষণা করে।

*   *   *

একদিন দেখি, খালিগায়ে লুঙ্গি পরে বসে আছেন, কিন্তু নীচে একটা ছোট ইজের। পরে বুঝেছি, মোটা মানুষ বলে এইটি তিনি অভ্যাস করেছেন—কোমরে ধুতি গুঁজে রেখে তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। এ জন্যই সম্ভবত কখনও কখনও বাইরে যাওয়ার সময় লম্বা পাজামা চুড়িদার পায়জামা প্রভৃতি পরতে দেখি।

এ সব ধুতির মত খুলে যাবে না—নিশ্চিত থাকা যায়। উপরে পাঞ্জাবী জাতীয় একটা জামা হলেই হল—কখনও খাটো ঝুল, কখনও লম্বা।

*   *   *

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি (১৯৪৪), ভারতের ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়ান্সের চেয়ারম্যান (১৯৪৮-৫০), বুদাপেস্টের শান্তিসম্মিলনের সভ্য (১৯৫৩), ভারতসরকারের 'পদ্মবিভূষণ' (১৯৫৪), বিশ্বভারতী বিশ্ববিত্থালয়ের উপাচার্য (১৯৫৬), কলকাতা, যাদবপুর ও এলাহাবাদ বিশ্ববিত্থালয়ের ডক্টর উপাধি (১৯৫৭), এফ. আর. এস (১৯৫৮), বিশ্বভারতীর 'দেশিকোত্তম' (১৯৬১) এবং ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের ডক্টরেটের (১৯৬২) পৃথক্ পৃথক্ রূপ পরিচ্ছদ।

এই সবরকম পোশাকেই তিনি অভ্যস্ত। অনেক প্রতিষ্ঠান পদ বা উপাধির সঙ্গে এই সব পোশাক তাঁকে উপহার দিয়েছেন। সবই শিল্ক বা ঐ জাতীয়—বর্ণ তার উজ্জ্বল—কোনটিতে বা বিচিত্র কারুকার্য। শীত গ্রীষ্ম বিচার করে যখন যা প্রয়োজন, টুপি, জামা বা চাদর তিনি বাইরে যেতে ব্যবহার করেন—ফেলে রেখে লাভ কী ?

১৯৬২ সনে আগস্ট মাসে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে যখন জাপানে গিয়েছিলেন, তখন লুঙ্গি পরেই সর্বত্র গমনাগমন করতেন। প্রায় ২০ দিন সেখানে ছিলেন। বললেন, 'যা গরম !'

* * *

অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায় এসে বসলেন ; বললেন, "ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা' দেবার জন্য ভারতীয় বিজ্ঞান-সমিতি হতে আপনার কাছে চিঠি এসেছে। এখনও উত্তর যায় নি। সবাই শঙ্কিত হয়েছেন। কেউ কেউ ভয় পাচ্ছেন, সম্ভবত চিঠির ভাষা ঠিক হয়নি।"

সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, 'বেশ তো, বলব আমি। কি চিঠি লিখেছিলে, হয় তো দেখিই নি আমি। আজকাল সব চিঠি পড়া হয় না, অন্যত্র গেলে সময়মত চিঠি পাইও নে। গামছা পরে বসে আছি, (নীচে আছে সেই ইজের), কিছু মনে কোরো না। তোমার বাবা কেমন আছেন ? কাল চলে যাচ্ছি স্টকহোলমে, শান্তি-সম্মিলনে। ৭।১০ দিনে ফিরে আসবো। তোমাদের সভার তো দেরি আছে।'

* * *

একদিন দুটি যুবক এসে প্রণাম করে দাঁড়াল। বললেন, "আজ আবার কী ? ও, আজই তোদের সেই সভা। কিন্তু টাকা ? বঙ্গীয়-বিজ্ঞান-পরিষদের জন্য তোদের টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি ? টাকা ঠিক আছে ? বেশ। তা, গাড়ী আনবি বৈ কি ? আমি কি হেঁটে যাবো ?"

* * *

ফেলে যাওয়া কলমটা নিতে, পথ থেকে তাঁর বাড়ীতে যখন ফিরলাম, তখন তাঁর দুপুরের খাওয়া হয়েছে। যে মাদুরে বসে নিজেই দাড়ি কামাচ্ছিলেন, সেটি উঠে গেছে, সিগারেটের ছাইদানি যেটি পাশে ছিল, তাও আর নেই। বসে বসে পান খাচ্ছেন, সুগন্ধি জর্দার কৌটা সামনে খোলা। ছোট মেয়ে খুকুর সঙ্গে বসে বসে গল্প করছেন।

বললেন, "তুমি স্নান করে খেয়ে বেরিয়েছ, জানি। তবু একটু বোস, একটু মাছ ভাজা খাও। এই কাসন্দ দিয়ে খাও। কাসন্দ এক ঢাকাই পরিবার হতে এসেছে। তাঁরা আমার বন্ধু। এই নাও পান।"

এই সুযোগে জানতে চাইলাম, তিনি সারাদিনে কখন্ কি খান। বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিকরা কে কি খান, তা জানতে আমার খুব ভাল লাগে। যিনি যা খেতে ভালবাসেন বা খেতে অভ্যস্ত, তা নাকি তাঁর স্বভাব, চরিত্র, প্রতিভার উপর প্রভাব বিস্তার করে বলে একটা চলতি ধারণা আছে।

প্রত্যূষে একটু বেল। তার পর চা ও রুটি। নটা নাগাদ আবার চা। দুপুরে মাছের ঝোল ভাত, যা বাঙালীর খাদ্য। তিনটায় চা, একটু ফল। সন্ধ্যায় খৈ-দুধ। রাত্রে বাঙ্গালীর মাছ ভাত (ছয় মাস পরে জেনেছি, ডায়াবেটিসের জন্য ভাতের বদলে রুটি চলছে, অন্য খাদ্যও বদল হয়েছে)। বললাম,"সারাদিনে দুধ তো বেশী খান না, দেখছি। শরীর তো ভালই আছে।"

বললেন, "খুব ভাল নেই চোখের জন্য। এই জন্যই দ্রুত আর পড়তে পারিনে।"

বললাম, "আপনার চোখের ব্যবহার খুব। কিছু কমিয়ে দিতে পারেন।"

"চোখের ব্যবহার! আমার বাবাকে তো দেখেছ? এখন বয়স ৯৪। তাঁকে নিয়ে যখন ঢাকা হতে চলে আসি, তখন বয়স ৭৬। অল্প আগে ওখানে তাঁর এক চোখের ছানি কাটান হয়। অন্য চোখটি অকেজো। ঐ এক চোখ অনেকদিন পর ব্যবহার্য অবস্থায় পেয়ে, 'ঢাকা হলে'র সব রকম বই-ই ছয় মাসে তিনি পড়ে ফেললেন।"

একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনি Heredity (বংশপরম্পরাগত গুণ) মানেন?"

উনি বললেন, "মানব না? আমি যে বৈজ্ঞানিক।"

* * *

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভাষণ দেন, তাতে আঞ্চলিক ভাষাতেই বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার প্রস্তাব করলেন। এই কথা নিয়ে সংবাদপত্রে খুব তরঙ্গ উঠল, স্বপক্ষে ও বিপক্ষে। মূল ভাষণটিতে কি ছিল, দেখার জন্য তাঁর কাছে গেলাম। ছাপান ভাষণ একখণ্ড আমাকে দিয়ে বললেন, "দিল্লি যেতে হয়েছিল গভর্নমেন্টের বিজ্ঞান-সমিতির সভায়। দিল্লিতে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি বললেন, 'ইংরাজী একবারে বর্জন করতে যখন বলা হয়নি, তখন এত বিরুদ্ধতা কেন?' যাক্, তুমি পড় আমি কি বলেছিলাম।"

"ইতিহাস দ্বারা একটা ক্রমপরিণতি দেখাবার রীতি তোমার আছে। দেখ, আমিও ইতিহাসের সূত্র অনুসরণ করেছি।

আজ তাড়াতাড়ি যেও না, এসো—গল্প করা যাক্। তোমার সেই শুকনো কাশিটা সেরেছে দেখছি। দিল্লিতে আমারও সর্দিকাশী হয়েছিল। রৌদ্র এড়িয়ে চলতাম। এখন সেরেছি। মনের জোরে সারাবে ভেবেছিলে? অগত্যা ওষুধ খেয়েছিলে? বেশ করেছিলে। মনের জোরেও সারে। তবে সব সময় নয়।"

* * *

নানা কারণে—তথ্য, সুন্দর স্বচ্ছ ইংরাজী ও বক্তব্যের সুস্পষ্টতার জন্য—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণটি অতিশয় মূল্যবান্। অন্য অধ্যায়ে এই ভাষণটির কিয়দংশ মুদ্রিত হল। নানা পত্রিকায় তাঁর প্রস্তাবের সমর্থন প্রকাশিত হয়েছিল। আমার চোখে যা পড়েছিল, তা দেখিয়েছিলাম। এ জন্য তিনি যে খুব উদ্গ্রীব, তা বোধ হল না। বিরুদ্ধে যা প্রকাশিত হয়েছিল, তা কতক তিনি জেনেছিলেন, এবং এদের লেখকদের অঙ্গাঙ্গীভাব জেনে বুঝেছিলেন, তাঁদের উৎসাহ ও লেখনীর মূল উৎস কোথায়। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ যা বলেছেন তার মর্ম হল এই যে, ক্ষমতার কোন্ সূত্র কোথায় ক্রিয়া করে "এসবে সত্যেনের কোন আকর্ষণ নেই।"

বললাম, "ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে, তাঁকে ভাষণ দিতে বিশ্ববিদ্যালয় আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে, সেই সভাতেই তখনই ভাইস চ্যান্সেলারের এই প্রতিবাদ; এ কেমন ভদ্রতা হোলো?"

যেন শুনলেনই না।

* * *

সত্যেন্দ্রনাথকে শিশুর সাথে খেলতে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নৈহাটি শাখার সম্পাদক, আমার বান্ধব অতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন কর্তৃক আমার ব্যবহারের জন্য প্রেরিত নিম্নলিখিত বিবরণটি মনোহর।

"নৈহাটিতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্মভিটায় তাঁর জন্মোৎসব পালন উপলক্ষে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার অনুরোধের জন্য প্রথিত-যশা বৈজ্ঞানিক শ্রদ্ধেয় সত্যেন বসুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। সে হল ১৯৫৭ কিম্বা ১৯৫৮ সনের কথা। সংবাদ পেয়েই আমাকে ভেতরে যেতে বললেন।

এই বিরাট্ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রতিভাধর মানুষের কাছে কি ভাবে দাঁড়াব, প্রার্থনা জানাব—তাই ছিল আমার সমস্যা। ভিতরে প্রবেশ করে যে-দৃশ্য দেখলাম, তাতে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে গেলাম। একবার মনে হল, ঠিক ব্যক্তির কাছে এসেছি তো? ভুল করলাম না তো! এও কি সম্ভব! এত বড় বিজ্ঞানী, বিশ্ববিখ্যাত যিনি, তিনি বালকের ন্যায় এত সরল!

দেখলাম, তিনি কয়েকটি ক্ষুদ্র বালকের সঙ্গে কেরম খেলায় ব্যাপৃত। সে খেলায় খুবই মনোযোগ ও অসাধারণ নৈপুণ্য। অবশেষে অতি কষ্টে আমার বক্তব্য পেশ করলাম। তিনি ষ্ট্রাইকার ধরে লক্ষ্য স্থির করে আমাকে সস্নেহে বললেন, 'অন্য ব্যক্তিকে করোগে, ভাই।'

শব্দগুলি যেন স্নেহসুধাসিক্ত ছিল। আমি পুনরায় তাঁকে অনুরোধ করলাম। তিনি কোনরূপ উপেক্ষা না করে আমাকে বরং অধিকতর স্নিগ্ধ স্বরে তাঁর অসম্মতি জানালেন।

পরক্ষণেই দেখলাম, তিনি খেলায় খুব নিমগ্ন হয়ে গেলেন। যদিও সে দিন ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরেছিলাম, তথাপি তাঁর এই তন্ময়তা ওকুসুমের ন্যায় চিত্তমাধুর্য আমাকে মোহিত করেছিল। তাঁর এই একাগ্রচিত্ততা ও নিষ্ঠা এবং বালক-বাৎসল্য দেখে তাঁর প্রতি আমার হৃদয়ের কোণে অপার শ্রদ্ধার সঞ্চার হল।"

* * * *

একদিন বললেন,"গৌরাঙ্গদেবের জীবনী ভাল করে পড়তে ইচ্ছা হয়েছে। বই এনে দাও। আমি চাই তাঁর জীবনের তথ্য ; তাঁর প্রতি ভক্তির আতিশয্য যেখানে সব আচ্ছন্ন করেছে, তা পড়ে কি করব ?"

বললাম, "প্রথমে গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরীর 'শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ' এনে দিচ্ছি। পরে অন্য বই দেব।"

উনি বললেন, "দেখ, ধর্মপ্রবর্তক অনেক এসেছেন এই দেশে। কিন্তু জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই সত্যি জাতিকে গড়তে চেয়েছিলেন, তা পাচ্ছি না কেন ? তাই কি আমাদের এই দশা !"

* * *

তাঁর র‍্যাকের বই হতে মনিয়ার মনিয়ার উইলিয়মস্-এর বিরাট সংস্কৃত অভিধানটি (ইংরাজী হরফে লেখা) আমি চেয়ে বাড়ীতে নিয়ে এলাম। চার দিন পরে বইটি ফিরিয়ে

দিয়ে বললাম,"এ যে অনেক দামের বই—৬ পাউণ্ড ৫ শিলিং। প্রায় শ টাকা দাম!"

বললেন, "নব্বই টাকায় কিনেছিলাম। সংস্কৃত ভাল করে পড়ার ইচ্ছা হয়েছিল।"

"অত দামী বই, নাম লেখেন নি কেন?"

"নাম!" বলে, স্মিতমুখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তখন র‍্যাকের অন্য বই কতকগুলি খুলে খুলে দেখলাম; উপহৃত বইগুলি ছাড়া অন্য কোনটিতে নাম বা অন্য চিহ্ন নেই।

* * *

একদিন সকাল বেলা (২৯ শে মে, ১৯৬৩) দেখি, খাটের উপর বসে সত্যেন্দ্রনাথ বই পড়ছেন, হাতে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস-প্রকাশিত বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলীর এক খণ্ড। তাঁর সামনে রয়েছে তার আর এক খণ্ড, বিদ্যাসাগর-চরিত, নগেন বাবুর রামমোহনের জীবনী ও ডাঃ ভূপেন দত্তের লেখা ইংরাজী স্বামী বিবেকানন্দ,Patriot-Prophet। সেদিন এঁদের প্রসঙ্গই হল। কথায় কথায় সত্যেন্দ্র মজুমদারের বিবেকানন্দ-জীবনীও র‍্যাক হতে আমি নামিয়ে আনলাম।

সে দিন আলোচনায় দেখা গেল, পরমহংসদেবের মৃত্যুর (১৮৮৬) পর হতে চিকাগো যাত্রার (১৮৯৩) পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ৬ বৎসর যে বিবেকানন্দ সন্ন্যাসিরূপে সারা ভারতে বেড়ালেন, তখন ভারতের মঙ্গল-সাধনা তাঁকে চিন্তা ও কর্মের কোন্ কোন্ পথে নিয়ে গিয়েছিল, তারই অনুধ্যানে অধ্যাপক বসু এখন নিমগ্ন হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি দেশনেতা-গণের জীবন-কথা তাঁর চিন্তায় আবার নূতন করে এখন আসন পেতেছে। আজ তাঁর কথায় আরো পেলাম, তাঁর কৈশোর-যৌবনের কালের ভারত-সাধনার কথা, তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা।

"অনুশীলন সমিতি ছিল, বোমা ছিল, বীরাষ্টমীতে অস্ত্র-পূজা করতাম, যা ঘটাতে চাওয়া হয়নি, তাও ঘটে গেল এখানে ওখানে, দুটি মেয়ে মরে গেল। তখন এমনি চলেছিল। বলতে সঙ্কোচ হয়, তবু আজ বলতে পারি, দেশের অগ্রগতির এরূপ পদ্ধতিতে ছেলেমানুষী ছিল। তবে, যে তেজস্বিতা ও আকাঙ্ক্ষা দেখেছি, তা আমাদের তরুণ মনে উদ্দীপনার সঞ্চার করত।

ছেলেরা আমরা খুব আলোচনা করতাম। এক দল বলত, জ্ঞানের পথে দেশের মঙ্গল হবে—এসো, প্রথমে নিরক্ষরতা দূর করতে লেগে যাই। আর এক দল বলত, দাঁড়াও…একবার ইংরাজ তাড়িয়ে নি, একদিনে নিরক্ষরতা দূর করে দেব।

স্বাধীনতার পর ১৫।১৬ বছর হয়ে গেল ; নিরক্ষরতা কতটুকু কমেছে ? কমাবার জন্য আমরা কী করেছি! যদি সর্বসাধারণের মধ্যে আধুনিক জ্ঞানের আলো প্রবিষ্ট না হয়, তবে আমরা জাতি হিসাবে পঙ্গু হয়ে থাকব—জনসাধারণই তো জাতিকে রক্ষা করে।"

* * *

সে দিনই বললেন, "মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে হবে, তাতে বিজ্ঞানও শিক্ষা দেওয়া যায় এবং এই পথেই দ্রুত নিরক্ষরতা

দূর হবে। আচার্য রায় 'প্রাণি-বিজ্ঞান' লিখেছিলেন বাংলা ভাষায়। তুমি বলছ, ও-বই ছেপেছিলেন ১৯০২ সনে; সেই বহু চিত্রসম্বলিত বই তুমি পরে দেখেছ। বেশ তাই হল; তারও আগে দেখ, ১৮৮৪ সনে, আচার্য প্রমথনাথ বসু 'প্রাকৃতিক ইতিহাস' (Rudiments of Geology and Physical Geography) প্রকাশ করেন। এই আচার্যেরা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শেখাবেন বলে অত আগেই চেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন। আজও তা সর্বত্র স্বীকৃত ও অনুসৃত হল না।"

* * *

'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ফর দি কালটিভেশন অব সায়ান্স'এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। ১৯৬২ সনে প্রতিষ্ঠানটি 'মহেন্দ্র সরকার বক্তৃতা' দেবার জন্য অধ্যাপক বসুকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। এই বক্তৃতা-সভার তিন দিন আগে তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। একটা ইতিহাসের বই চেয়েছিলেন। বললেন, 'Mahendra Sarkar Lecture' দিতে হবে। সময় পাচ্ছিনে। কিছুই লিখিনি। তোমার লেখা তাঁর জীবনীটি দেখ, বার করেছি। মুখে মুখেই বলব, না লিখব? লেখা হয়ে উঠবে না বোধ হয়। হাত চলে না তেমন।"

বললাম, "না লিখলে বলার শৃঙ্খলা রাখা শক্ত এবং তা ভেসে যায়। আচার্য রায়ের বক্তৃতা আমি অনেক বার কাগজে ধরেছি। কাল বিকালে আমি এসে লিখে দিতে পারি, যদি আপনি মুখে বলে যান।"

উনি উৎসাহ দিলেন না। সম্ভবত এতে তাঁর ধ্যানপ্রসূত

লেখার বৈশিষ্ট্য থাকবে না। সাত দিন পর দুটি ছোট একসার-সাইজ খাতা আমায় এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এই সেই বক্তৃতা, বাংলায় লিখেই পড়েছি। পড়। অন্য কথা থাক। পড় তুমি। দেখ কেমন হয়েছে।"

দেখলাম, বাংলাভাষায় আধুনিক বিজ্ঞানের এক ভূমিকা। কিন্তু এই ভূমিকার শেষে দেখা গেল, এই পৃথিবীখ্যাত বাঙ্গালী বিজ্ঞানী আজ মানুষের ভবিষ্যতের চিন্তায় জগতের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীদের সাথে যোগ দিয়েছেন।

"মানুষের ভবিষ্যৎ মানুষের হাতে—সে যদি অনুসরণ করে ব্যক্তিনির্বিশেষে দয়া ও সহযোগিতার মনোভাব, তা হলে যে সংঘাত ও দ্বেষের প্রকোপ আজ দেখা যাচ্ছে, তার নিরসন হবে। তা হলেই সার্বজনীন বিশ্বমানবের আবির্ভাব হবে। অন্যথায় যেমন অতিকায় জীবজন্তুরা অতীতেই লোপ পেয়েছে ও সাক্ষ্য দিতে আছে কেবল তাদের প্রস্তরীভূত কঙ্কালের অবশেষ, ভবিষ্যতে মানব-সভ্যতারও ঐরূপ বিষাদভরা পরিণাম হওয়া বিচিত্র নয়। বিজ্ঞানের এই কথার, আমাদের দেশের অনেক সাধুর শিক্ষার সঙ্গে মিল আছে বলে মনে ঠেকে। যে ধর্ম-বিশ্বাস সমাজনীতি, জাতিভেদ ও হিংসাদ্বেষের মূল কথা হয়ে রয়েছে, তার সঙ্গে বিজ্ঞানের মিল নেই। বরং অজ্ঞান থেকে তার উদ্ভব হয়েছে বলা যায়।...ভবিষ্যতে সভ্যতা গড়ে তুলতে হবে জাতিধর্মনির্বিশেষে, তার মধ্যে থাকবে সব মানুষের স্থান। বিজ্ঞানোচিত মনোভাব, হিংসাদ্বেষের পরিবর্তে সহযোগিতা ও প্রেমের প্রতিষ্ঠা দরকার।...বিজ্ঞানের পথেই জয়লাভ হবে।"

পরিশিষ্ট (ক)

সত্যেন্দ্রনাথ বসু লিখিত পুস্তক

Einstein. A. and Minkowski . H.
The Principles of Relativity, 1920.
(published by the University of Calcutta, 1920).
P. C. Mahalanobis ও Dr. Meghnad Sahaর সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থকার হলেন।

পরিশিষ্ট (খ)

সত্যেন্দ্রনাথ লিখিত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ, বাংলা ভাষায়ঃ

বিজ্ঞানের সঙ্কটঃ পরিচয়, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৮

আইনষ্টাইন : পরিচয়, ৪র্থ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৪২

শক্তির সন্ধানে মানুষ : জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ১ম বর্ষ, মার্চ, ১৯৪৮

আইনষ্টাইন : জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ১৯৫৫

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার স্মরণে : জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ১৫শ বর্ষ, মার্চ, ১৯৬২।

১৯৬২-হায়দ্রাবাদে 'আংরেজী হটাও সম্মেলনে' বক্তৃতার টেপরেকর্ড

পরিশিষ্ট (গ)

সত্যেন্দ্রনাথ লিখিত বক্তৃতা, ইংরাজী ভাষায় :

Convoction Address, University of Calcutta, 24th March, 1962

Convocation Address, University of Ranchi, 22nd March, 1963

পরিশিষ্ট (ঘ)

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ, বিদেশী ভাষায় :

1918—M. N. Sahaর সঙ্গে—A new equation of State in Stresses in Medium. Phil. Mag. 36, 199, 1918

1920—Energy Spectrum of an atomic model, Phil. Mag., 40, 619, 1920

1924-25—(১) Planck's law and the light quantum hypothesis, Zeitschrift fur Physik, 27, 384, 1924

(২) Heat equilibrium in Radiation field in presence of matter, Zeitschrift fur Physik, 1924

এই তত্ত্বই হয় 'বসু-আইনষ্টাইন ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স'

1929—Tendencies in the Modern Theoretical Physics, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ

1944—The classical determinism and the Quantum Theory, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল-সভাপতির অভিভাষণ

1953—Unitary Theory, Comptes Rendus, 1953

1958—Crystallography. প্যারিসে আন্তর্জাতিকসভায় পঠিত

পরিশিষ্ট (ঙ)

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় পরিভাষা রচনাকারীদের নাম :

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অপূর্বচন্দ্র দত্ত, মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায়, কালিদাস মল্লিক, বলীন্দ্র সিংহদেব, হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, শশধর রায়, একেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ দেব, অম্বুজাক্ষ সরকার, রাখালরাজ সরকার, রাসবিহারী মণ্ডল, অবিনাশচন্দ্র মজুমদার, অনঙ্গমোহন সাহা, চূণীলাল বসু, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ও সুকুমাররঞ্জন দাশ প্রভৃতি। (৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পরিশিষ্ট (চ)

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনাকারীদের নাম ঃ

(ঙ) পরিশিষ্টে উল্লেখিত বিজ্ঞানীদের অনেকে বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আর যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁদের নাম—

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী, মেঘনাথ ভট্টাচার্য, হরমোহন মজুমদার, নিবারণচন্দ্র মজুমদার, চিত্তসুখ সান্যাল, গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পঞ্চানন নিয়োগী, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য, সূর্যনারায়ণ সেন, মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র দত্ত, জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত, দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, জগদিন্দু রায়, সুরেশচন্দ্র দত্ত, রসিকলাল দত্ত, নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ, ক্ষিতিভূষণ ভাদুড়ী, তারকেশ্বর ভট্টাচার্য, যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, নরেন্দ্রকুমার মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ কোঙার, দেবপ্রসাদ ঘোষ, সরসীলাল সরকার, তারকেশ্বর ভট্টাচার্য, রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস সাহা, সত্যচরণ লাহা, গণপতি সরকার, নিখিলরঞ্জন সেন, বিভূতিভূষণ দত্ত, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, পঞ্চানন ঘোষাল, নির্মলকুমার বসু, শরৎচন্দ্র রায়, রমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

টেলিফোন—৪৮-৩৫৯১
৭২, বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত

প্রীতিভাজনেষু

আপনার লেখা 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়' বই পড়ে আনন্দিত হলাম। তাঁর জীবন-চরিত অনেক প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু আপনার লেখা এই বইএর মতন সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ বিবরণ আর কোথাও দেখি নি। আপনার ভাষাও মনোহর। মনে হয় এই বই স্কুলের পাঠ্যরূপে অথবা পারিতোষিক গ্রন্থ হবার যোগ্য।

আপনার
রাজশেখর বসু

স্যার ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ঃ...অতি সুপাঠ্য এই বই।...

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ঃ...অতি সুন্দর হইয়াছে।...

অধ্যক্ষ প্রিয়দারঞ্জন রায় : পাঠ করে তৃপ্তিলাভ করেছি। লেখা সহজ সরল সুখপাঠ্য হয়েছে।...আচার্যদেবের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ নির্ভরযোগ্য তথ্যের জন্য বইখানি মূল্যবান্।...

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় :...পাঠ করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইলাম।...

ডাঃ হরগোপাল বিশ্বাস :...জীবনী লিখিয়া শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত একটি মহৎকার্য সম্পাদন করিয়াছেন।...

ভারতবর্ষ : প্রত্যেক পংক্তিতে আচার্যদেব সম্বন্ধে নূতন কথা আছে, অথচ ইহা তথ্যসংগ্রহ মাত্র নহে।...

শনিবারের চিঠি : স্বল্প আয়তনের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের মহৎ গুণাবলীর ঐকান্তিক লেখা-চিত্র অঙ্কনে সক্ষম হয়েছেন।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান :...এরূপ তথ্য-সমৃদ্ধ সহজলভ্য একখানি পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল।...

আনন্দবাজার পত্রিকা :—জীবনপঞ্জী ও পরিশিষ্ট বইখানির গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে।..

প্রবাসী: ভাষা ভাল। সব কথা গুছাইয়া বলিবার মুন্সিয়ানা আছে।

মধ্যশিক্ষা-পরিষদের স্পেশাল অফিসার শ্রীপ্রমোদচন্দ্র দাস :... এই জীবনী পড়িতে আরম্ভ করিয়া শেষ না করিয়া উঠিতে পারি নাই।...বর্তমান আদর্শহীনতার দিনে এই প্রকারের জীবন-আলেখ্যের প্রতি তরুণ সমাজের সসম্ভ্রম দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে মহদুপকার সাধিত হইবে।

The Indian PEN :...Removes a longfelt want and deserves to be translated into English and regional languages of India. . .

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুঃ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী প্রকাশিত। ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি ঃ ১২। পৃঃ ৯৬। মূল্য ১·২৫ টাকা

আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ—বৃহৎ জীবনকে অল্পায়তন গ্রন্থের মধ্যেও গ্রন্থকার নিপুণতার সঙ্গে রূপায়িত করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন ; ইহা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে।···

রাজশেখর বসু ঃ চমৎকার হয়েছে। চরিতকথা মনোহর ভাষায় আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেছেন, তাঁর বৈজ্ঞানিক কৃতির পরিচয়ও দিয়েছেন।···

যুগান্তর ঃ—এই গ্রন্থ পাঠ করিলে শিক্ষার্থীদের মন স্বভাবতই বিজ্ঞানচর্চার দিকে আকৃষ্ট হইবে।···

শিক্ষাসাথী ঃ—কীর্তি চমৎকার ভাবে বিবৃত করেছেন—বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।···

স্বাধীনতা ঃ—হৃদয়গ্রাহী এবং সুলিখিত···সহজ সরল ভাষা বিজ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহ সঞ্চারিত করিবে।··

যষ্টি-মধু ঃ—এই বইখানির প্রত্যেক লাইনেই জগদীশচন্দ্রের সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য জানতে পারা যায়। ভাষা সহজ ও সরল। বিশেষ করে ছোটদের পড়বার পক্ষে উপযোগী।···

Amrita Bazar Patrika : Shri Gupta has rendered a service to the Nation ; attractive style··

The Indian PEN : yet another book of note very recently published is the life of Dr. Mahendralal Sarkar, the great scientist of Bengal, by Mono-ranjan Gupta, a chemist, who has to his credit a well-known treatise on Sir Jagadish chandra Bose....

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার : ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী,
৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি : ১২ প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮০।
মূল্য ১·২৫ টাকা

ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে : শ্রীযুক্ত গুপ্তের এই স্মৃতিতর্পণ শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রের পঠনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে আর একটি মনোরম জীবনী ও কর্মবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থ লেখক হিসাবে তাঁহার যশ অক্ষুণ্ণ রাখিবে।···

অধ্যক্ষ প্রিয়দারঞ্জন রায় : আপনি হৃদয় দিয়ে মহেন্দ্রলালের মহত্ত্ব অনুভব করে হৃদয় দিয়েই তা কথায় রূপায়িত করেছেন। এর সহজ, সরল স্বচ্ছন্দ ভাষা যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি মহেন্দ্রলালের চরিত্র অঙ্কনে আপনার ঐকান্তিক সহানুভূতির পরিচয়ও পরিস্ফুট। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের কীর্তিকলাপের লুপ্তপ্রায় স্মৃতি উদ্ধার করে বাংলা দেশের তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য যে তাঁকে মনোজ্ঞ ভাষায় বিবৃত করেছেন, দেশের কাজ হিসাবে এর মূল্য অপরিমেয় মনে করি। আশা করি, বইখানি সাধারণের নিকট এবং মাধ্যমিক ও উচ্চাঙ্গের বিদ্যাপীঠ সমূহে পুরস্কার হিসাবে সমুচিত সমাদর লাভ করবে।

প্রবাসী : লেখকের ভাষা সরল ও সংক্ষেপিত হইলেও ইহা তথ্য-বহুল। এইরূপ জীবনের সঙ্গে পরিচিত হইয়া ছেলেমেয়েরা উপকৃত হইবে।

Registrar of General Council and State Faculty of Homeopathic Medicine, West Bengal :
The book should be read by the Homeopathic profession and the students.···

আচার্য প্রমথনাথ বসু : বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ্,
২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি : ৯, প্রকাশিত।
পৃষ্ঠা ১৪ + ৮১ = ৯৫ ॥ মূল্য ১·০০ মাত্র

জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু :—মনোরঞ্জন বাবু অতি নিপুণতার সঙ্গে বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রমথনাথের কর্মবহুল জীবনের এক সুন্দর তথ্যপূর্ণ কাহিনী লিখেছেন। তাঁর দীর্ঘ কালের অনুসন্ধানে বহু খবর প্রকাশ হয়েছে। কেবল ঘটনার বিবরণ নয়, তাঁর জীবনের কর্ম ও সাধনা, ব্যক্তিত্ব ও শক্তি এমন সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে যে, তাঁর জীবনের সাথে সাথে সেই বিগত বরেণ্য যুগটাই সম্মুখে জেগে ওঠে।

বিশ্বভারতী পত্রিকা : লেখকের রচনারীতি প্রাঞ্জল··· জীবনপঞ্জীটি ঐতিহাসিক উপাদানের দিক থেকে মূল্যবান্।

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত লিখিত ইংরাজী পুস্তক

HISTORICAL RELICS etc. in the Bangiya Sahitya Parisad Museum : (Published by the Bangiya Sahitya Parisad). Pp. 57. Price Rs 2/-

Amrita Bazar Patrika : Shri Monoranjan Gupta has with great pains prepared this catalogue for those who love our history and culture. . In compiling the book he has left no avenues unexplored.···

Hindusthan Standard : The Contents of the little Museum are neatly arranged and noted in seven chapters. . This is Sri Gupta's competent effort at cataloguing the diverse collections···

দেশ : এই গ্রন্থটি অনুসন্ধিৎসু ও বিশেষজ্ঞদের জন্যই রচিত।

TWO NEW PALA RECORDS, (First Published in the Journal of the Asiatic Society) with 3 maps and 5 plates: Foreword by Dr. Niharranjan Ray : Published by Manmatha Ray, 229C, Vivekananda Road, Calcutta-6.

Prof. Dineshchandra Bhattacharya : No orthodox epigraphist could have done better than what Sj. Gupta has done···

Dr. D. C.Sircar : Your treatment of the epigraph is a success and your discussion of geographical names in the inscriptions very interesting···

Prof. Prabodhchandra Sen : Shri Monoranjan Guptahas won for his work a place in the future reconstruction of the early history of Bengal···

Prof. Chintaharan Chakravorty : I hertily congratulate you for your critical study···

Dr. Niharranjan Ray: His is no amateurish attempt at historical and archaeological research.

Dr. L. Renou (Paris) : It is a very accurate work and I think your identification can not be easily rejected.···

Dr.L.D. Barnet (London) : It is indeed a valuable contribution to the historyof brilliant PalaPeriod.

Mr. J. Allen (Edinburgh) : Fills a gap in our knowledge of the medieval history of Bengal···

Dr. U. N. Ghosal, President, Asiatic Society : ···The admirable manner in which these Problems have been tackled by the Author···

TWO NEW PALA RECORDS

10, Lake Terrace,
Calcutta 29,
9th Sept. 1951.

Sri Manoranjan Gupta by a long and scholarly study of the Belwa copper-plates, has greatly advanced our knowledge of a corner of north-Bengal history in the Pala period. The value of his printed studies on this subject has been enhanced by the new problems he has posed, and the hints that he has thrown out for research in certain new directions. I am hopeful of other scholars utilising this material and thus giving a fresh impulse to our study of Pala-yuga Bengal.

Jadunath Sarkar,
Hony M.R.A.S.